চাকমা লোকসাহিত্য

নন্দলাল শর্মা

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

চাকমা লোকসাহিত্য

নন্দলাল শর্মা

সূচীপত্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

সূচীপত্র

প্রকাশক ❑ সাঈদ বারী
প্রধান নির্বাহী, সূচীপত্র
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
ফোন ❑ ৭১১৩৮৭১

চাকমা লোকসাহিত্য
নন্দলাল শর্মা

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০০৯
স্বত্ব ❑ গ্রন্থকার
প্রচ্ছদ ❑ সব্যসাচী হাজরা
বর্ণবিন্যাস ❑ মাহমুদ কম্পিউটার প্রিন্টার্স
হক সুপার মার্কেট, পূর্ব জিন্দাবাজার, সিলেট
মুদ্রণ ❑ সালমানী প্রিন্টিং প্রেস, নয়াবাজার, ঢাকা

উত্তর আমেরিকায় পরিবেশক ❑ মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট্স, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
যুক্তরাজ্যে পরিবেশক ❑ সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিকলেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

CHAKMA LOKESAHITYA
by Nandalal Sharma

Published by Saeed Bari, Chief Executive, Sucheepatra
38/2Ka Banglabazar Dhaka 1100 Bangladesh
Ph : (880-2) 7113871
Price : BDT. 150.00 Only US $ 10.00

মূল্য : ৳ ১৫০.০০ মাত্র

ISBN 984-70022-0109-4

সবিনয় নিবেদন

রাঙ্গামাটি সরকারি কলেজে কর্মরত থাকাকালে (১৯৭৬-১৯৮৯) চাকমা সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করি। 'চাকমা লোকসাহিত্য' প্রণয়নে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমা জাতি' গ্রন্থ পাঠ করে। দীর্ঘদিন ধরে উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। যাঁদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে উপকৃত হয়েছি—রাজমাতা বিনীতা রায়, কুমার কোকনদাক্ষ রায়, সলিল রায়, অশোক কুমার দেওয়ান, সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা—তাঁদের কেউই আজ ইহলোকে নেই।

গ্রন্থটি প্রকাশে উৎসাহিত করেছেন বন্ধুবর জনাব চৌধুরী হারূন আকবর ও জনাব শামসুল করিম কয়েস। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার ব্যবহারে সহায়তা করেছে আমার প্রাক্তন ছাত্রী ইনস্টিটিউটের লাইব্রেরিয়ান কাম জাদুঘর সহকারী স্নেহভাজন হীরা রাণী বড়ুয়া। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরিমার্জনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ এবং চাকমা ভাষার উদ্ধৃতাংশ সংশোধন করে দিয়েছেন মি. মৃত্তিকা চাকমা ও মি. সোনামনি চাকমা। সূচীপত্রের প্রধান নির্বাহী জনাব সাঈদ বারী সানন্দে গ্রন্থটি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এঁরা সকলেই ধন্যবাদার্হ।

নন্দলাল শর্মা

সূচী

প্রসঙ্গ কথা	৭
লোকছড়া	১০
লোকগীতি	২০
বারমাসী	৩১
গীতিকা	৪২
ধর্মসম্পৃক্ত লোকসাহিত্য	৫৩
প্রবাদ	৫৭
ধাঁধা	৬০
লোককথা	৭৩
সূত্রনির্দেশ	৮৬

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক (১৯৮১)
পার্বত্য চট্টগ্রামের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকতা (১৯৮৩)
প্রকাশনা : পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতি (১৯৮৪)
তুমি আমাদেরই লোক (১৯৮৫)
ছোটদের রামমোহন (১৯৮৬; দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২)
নেপালে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (অনুবাদ, ১৯৮৭)
ডাকঘরের কথা (১৯৯১; দ্বিতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ ২০০৪)
দেওয়ান গোলাম মোর্তাজা (১৯৯২)
হবিগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন (১৯৯২)
মুহম্মদ নূরুল হক (১৯৯৩)
শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষদের ইতিকথা (১৯৯৪)
চৌধুরী গোলাম আকবর (১৯৯৫, বি.এন.এস.এ. পুরস্কার প্রাপ্ত)
সুনামগঞ্জের সাহিত্যাঙ্গন (১৯৯৫)
উত্তর প্রবাসী থেকে উত্তরাপথ (১৯৯৬)
মৌলভীবাজারের সাহিত্যাঙ্গন (১৯৯৭)
সিলেটের ফোকলোর রচনাপঞ্জি (১৯৯৮)
ফোকলোর চর্চায় সিলেট (১৯৯৯)
আল ইসলাহ পত্রিকায় মুসলিম চিন্তাচেতনা (২০০০)
আল ইসলাহ পত্রিকার লেখক ও রচনাসূচি (২০০০)
রাধারমণ গীতিমালা (সম্পা. ২০০২)
সিলেটের বারমাসী গান (সম্পা. ২০০২)
তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম (২০০২)
আকাশে হেলান দিয়ে (২০০৩)
মোহাম্মদ হানীফ পাঠান : জীবন ও কর্ম (২০০৪)
নিশীথে যাইও ফুলবনে (২০০৪)
সিলেটের সাহিত্যাঙ্গন (২০০৫)
পরিচিতির আলোকে জালালাবাদ লোকসাহিত্য পরিষদ (হারূন আকবর সহযোগে, ২০০৫)
তোমার সৃষ্টির পথ (২০০৫)
মরমী কবি শিতালং শাহ (সম্পা. ২০০৫)
মধুসূদনের প্রহসন (সম্পা. ২০০৬)
প্রমথ চৌধুরীর নির্বাচিত প্রবন্ধ (সম্পা. ২০০৬)
সত্যসন্ধ গবেষক মুহম্মদ আসাদ্দর আলী (২০০৬)
ঐতিহ্যের ধারক গোলাম মস্তফা চৌধুরী (২০০৬)
সিলেটের জনপদ ও লোকমানস (২০০৬)
চাকমা প্রবাদ (২০০৭)
চৌধুরী গোলাম আকবর : রচনা ও সংগ্রহ সম্ভার, ১ম খণ্ড (সম্পা. ২০০৭)
বশির মিয়া : আত্মিক আশ্রয় (সম্পা. ২০০৭)
বাঁশির সুরে অঙ্গ জ্বলে (সম্পা. ২০০৭)
লায়লা রাগিব রচনাসমগ্র (সম্পা. ২০০৮)
চাকমা কবিতা (সম্পা. ২০০৮)

প্রসঙ্গ কথা

এক

লোকসাহিত্যের যথার্থ কোন সংজ্ঞা নেই। পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতে এটি 'সংহত সমাজের সামগ্রিক সৃষ্টি, ব্যক্তিবিশেষের একক সৃষ্টি নহে।' (আশুতোষ ২০০৪:১) লোকসাহিত্য কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর অলিখিত সাহিত্য। M.J. Harskovits-এর মতে 'জাতীয় সংস্কৃতির যে সকল সাহিত্যিক ও মননশীল সৃষ্টি মুখ্যত মৌখিক ধারা অনুসরণ করে অগ্রসর হতে যায়, তাই লোকসাহিত্য; যেমন গীতিকা, কথা, সঙ্গীত ইত্যাদি।' (আশুতোষ ২০০৪:১৮) লোকসাহিত্য মুখে মুখে রচিত, প্রচারিত ও প্রচলিত হয়। এটি নিয়ত সজীব। ক্রম পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকে।

'লোকসাহিত্য একটি জাতির সাংস্কৃতিক সম্পদ। জার্মানিতে একটি প্রবাদ আছে-কোন জাতির অন্তরঙ্গ পরিচয় তার লোকসাহিত্যে পাওয়া যায়। লোকসাহিত্য মৌখিক ধারার সাহিত্য, যা অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে রচিত হয়। একটি বিশিষ্ট ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে একটি সংহত সমাজমানস থেকে লোকসাহিত্যের জন্ম হয়। যে সমাজের মানুষের ভাষা আছে, ভাব-ভাবনা আছে, আবেগ-কল্পনা আছে, সৃষ্টি ও প্রকাশের ক্ষমতা আছে, সেই সমাজের মানুষ লোকসাহিত্যের অধিকারী হয়। ...লোকসাহিত্য স্বতঃস্ফূর্ত ও কৃত্রিমতাবর্জিত। ...ব্যক্তি রচনা করলেও সমষ্টি তা লালন করে। এজন্য লোকসাহিত্য সমষ্টির ঐতিহ্য, আবেগ, চিন্তা ও মূল্যবোধকে ধারণ করে। ...এক কথায় লোকসাহিত্য জাতির সংস্কৃতির নির্মাণ ও বিকাশ সাধন করে থাকে।' (আহমদ ২০০১ : ১১)

লোকসাহিত্য একটি জাতির ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। একটি জাতি সুসভ্য না হলে সে কখনও লোকসাহিত্যের অধিকারী হতে পারে না। জাতীয় চিন্তাচেতনার প্রতিফলন লোকসাহিত্যে ঘটে। সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা ও মননশীলতার ধারক ও বাহক এটি। যে জাতির লোকসাহিত্য সমৃদ্ধ সে জাতির সংস্কৃতি তত উন্নত। লোকসাহিত্যের নানা শাখা-প্রশাখা আছে। যেমন সঙ্গীত, প্রবাদ, গীতিকা, ধাঁধা, ছড়া ইত্যাদি। আমাদের দেশে ব্রিটিশ আমল থেকে লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও প্রকাশ

শুরু হয়েছে। অর্থাৎ অলিখিত এই সাহিত্যকে সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ ও প্রকাশ করা হচ্ছে। পাশ্চাত্যে লোকসাহিত্য গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্য অধ্যয়ন ও গবেষণার ব্যবস্থা রয়েছে। আমাদের দেশেও লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের কাজ এগিয়ে চলেছে।

'বাংলার লোকসাহিত্য বা সংস্কৃতি আজ জগৎ সভার কাছে আদরণীয় বস্তু। একে নানা মনীষী যথেষ্ট মূল্যবান বলে স্বীকৃতি দিতে এবং তাকে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে ও নানা বর্ণপাতে স্থাপিত এক অফুরন্ত সম্পদ বলে উল্লেখ করতে কুণ্ঠা বোধ করেন নি। আমাদের দেশেও এ বিষয়ক আলোচনা একটি প্রিয় প্রসঙ্গ। শিকড়সন্ধানী দেশপ্রেমীদের কাছে এর মূল্য অপরিসীম। সাংস্কৃতিক আগ্রাসনরোধে এর উপস্থিতির অপরিহার্যতা আজ আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। প্রাচীন সম্পদ হিসাবেও এর প্রতি আমাদের একটি স্বভাবগত অনুরাগ বা আকর্ষণ রয়েছে।' (মনিরুজ্জামান ২০০২ : ১৩)

দুই

বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস দু'শতাব্দীর। বাংলাদেশে এর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে বাংলাভাষী ছাড়াও ভাষাগত সংখ্যালঘু অনেক ভাষাগোষ্ঠী আছেন। যেমন : চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, বম, লুসাই, পাংখো, গারো, খাসিয়া, মণিপুরী, সাঁওতাল, মুণ্ডা ইত্যাদি। এসকল জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সাহিত্য রয়েছে। অনেক আদিবাসীর লোকসাহিত্য বেশ সমৃদ্ধ। কিন্তু এ সম্পর্কে বলতে গেলে কোনো কাজই হয়নি।

বাংলাদেশে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস, তাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হল চাকমা জাতি। উপজাতি, আদিবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন পরিচয়ে তাদের চিহ্নিত করা হয়। এর কোনটি সঠিক তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও চাকমা জাতির স্বাতন্ত্রিক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ার মত। চাকমারা কয়েক শতাব্দী ধরে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করছেন। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান পার্বত্য জেলাত্রয় ছাড়াও চট্টগ্রাম, কক্সবাজার প্রভৃতি অঞ্চলে, ভারতের ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল রাজ্যে এবং মায়ানমারে চাকমারা বসবাস করছেন। তাদের আদিপুরুষ চম্পকনগর-তা মায়ানমার, আসাম, ত্রিপুরা, মালয়, হিমালয়ের পাদদেশের যে চম্পকনগরই হোক-থেকে মায়ানমার, আসাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে সাময়িকভাবে স্থিতিলাভ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেন। নৃতাত্ত্বিক বিচারে চাকমারা নব্য এশিয়াটিক মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাদের ভাষা মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীভুক্ত নয়-ইন্দোয়ুরোপিয়ান ভাষা পরিবারভুক্ত। চাকমাভাষা ইন্দোআর্য ভাষা শাখার

অন্তর্ভুক্ত বলে বাংলা, অহমিয়া, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার শব্দের সঙ্গে তার শব্দের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। চাকমা জাতির লোকসাহিত্য খুবই সমৃদ্ধ। জেলা গেজেটিয়ার্স-এ বলা হয়েছে 'The Chakmas have got no worthmentioning modern literature. But they are rich in respect of folk-literature.' (Ishaq 1975 : 211)

চাকমা জাতির প্রাচীন লোকসাহিত্য প্রমাণ করে তারা প্রাচীন সভ্যজাতি। তাদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে, সাহিত্য-সংস্কৃতি আছে। তাদের লোকসাহিত্য থেকে তাদের প্রাচীন সভ্যতা, সমাজ, সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করা যায়। আদিবাসী গবেষক আবদুস সাত্তার বলেছেন, 'আদিবাসী সাহিত্য লোকসাহিত্যের উৎসমুখ-যে উৎসমুখের স্রোতোধারা এসে লোকসাহিত্যে স্থিতি লাভ করেছে। আধুনিক মানব-বিজ্ঞানীরা মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরীক্ষা করে যেমন স্থির করেছেন যে বর্তমান মানবসমাজ আদিবাসী সমাজ থেকেই উদ্ভুত তেমনি আদিবাসী সাহিত্যও যে লোকসাহিত্যের জনক সে কথা বলাই বাহুল্য।

গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক জীবনকেন্দ্রিক সৃষ্টিশীল ও মননশীল সাহিত্য পদবাচ্য বিষয়সমূহ যেগুলো অলিখিত অবস্থায় মৌখিকরূপ অনুসরণ করে প্রচার লাভ করে আসছে সেগুলো যদি লোকসাহিত্যের উপকরণ বলে বিবেচিত হয় তবে আদিবাসী সাহিত্যও তাই; এবং এ ধারা লোকসাহিত্যের প্রাচীনরূপ।' (সাত্তার ১৯৭৮ : ২৩৩)

আবদুস সাত্তার আরও স্বীকার করেছেন 'চাকমাদের সাংস্কৃতিক অবদানে বাংলা লোকসাহিত্য যে সমৃদ্ধি লাভ করেছে একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে। ...চাকমা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছে চাকমাসমাজে প্রচলিত অজস্র প্রবাদ, ছড়া, ধাঁধা, পুরাকাহিনী, ইতিকথা, উপকথা, বারমাসী, লোকগাঁথা, প্রেমসঙ্গীত ও ভাবসঙ্গীত। লোকসাহিত্যের এমন উপকরণ যে সত্যি দুর্লভ তাতে সন্দেহ নেই।' (সাত্তার ১৯৭৫ : ৭৭)

চাকমা লোকসাহিত্যের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া গেল।

লোকছড়া

লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছড়া। ছড়ার আন্তঃপরিচয় প্রসঙ্গে লোকবিদদের দৃঢ়বিশ্বাস যে ছড়া 'সমগ্রভাবে ব্যক্তি কিংবা সমাজের সচেতন মনের সৃষ্টি নহে, বরং স্বপ্নদর্শী মনের অনায়াস সৃষ্টি।' (আশুতোষ ২০০৪:১৪৭)

ছড়াতে ছন্দ থাকে, অনেক সময় অর্থ থাকে না। ভাবের দিক থেকে ছড়া অসম্পূর্ণ, ইঙ্গিতবাহী। রূপের দিক থেকেও অনেক সময় অপরিণত। তবে ছন্দের জন্য এর রস গ্রহণে অসুবিধে হয় না। ছড়ার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির স্থান নেই, হৃদয়বৃত্তির স্থান আছে। তাই ছড়ার অর্থ স্পষ্ট না হলেও তা আকর্ষণীয়। ছড়া আবৃত্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। শিশুতোষ ছড়া শিশুরা আবৃত্তি করে। ঘুমপাড়ানি ছড়া আবৃত্তি করে মা শিশুকে ঘুম পাড়ান। শিশুরা ছড়া আবৃত্তি করতে পছন্দ করে। আবার বিভিন্ন পরিবেশে বা পরিস্থিতিতেও ছড়া আওড়ানো হয়। ছড়ার সুর সাধারণত বৈচিত্র্যহীন। 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন 'আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিদ্যার শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্র নিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে ও মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশুহৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা গুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে এবং ছড়াগুলিও ভাবহীনতা, অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্যবশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে। শিশু মনোবিজ্ঞানের কোন সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।' (আশুতোষ ২০০৪:১৪৭) নীতিকথা, সমাজচেতনা প্রভৃতিও ছড়ায় প্রতিফলিত হয়। চাকমা লোকসাহিত্যের একটি প্রধান অংশ ছড়া। ছড়া লোকমুখে সুদীর্ঘকাল থেকে প্রচলিত।

ছড়াতে ভাব থাকে না, থাকলেও অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ। অনেকে ছড়াকে লোকসাহিত্যের প্রাচীনতম রূপ বলে থাকেন। বাংলা লোকসাহিত্যের ন্যায় চাকমা লোকসাহিত্যেও ছড়া সুপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত হয়ে আসছে।

চাকমা লোকসাহিত্যের ছড়া প্রথম কখন লিপিবদ্ধ হয় বা সংগ্রহ করা হয় তা সঠিক করে বলা কঠিন।

R.H. Hutchinson-এর Chittagong Hill Tracts District Gazetter ১৯০৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত Bangladesh District Gazetteers-CHITTAGONG HILL TRACTS গ্রন্থে Hutchinson সাহেবের অনূদিত চাকমা লোককাহিনী 'জামাই মারনী' সংকলিত হয়েছে। অনুমিত হয় তাঁর গ্রন্থে চাকমা লোকছড়ার নমুনাও ছিল। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত গেজেটিয়ার্সে পাঁচটি চাকমা ঘুমপাড়ানি গান রোমান হরফে চাকমা ভাষায় ইংরেজি অনুবাদসহ সংকলিত হয়েছে। এগুলো মূলত ছড়া। ছড়াগুলো হচ্ছে :

১. এ কূলে কলাগাছ ঐ কূলে ছড়া
ন কানিস বাবুধন ঘুম যা ভাঙ্গিব গলা।

২. সোনার ধুলনৎ রূপার দড়ি
ন কানিস বাবুধন ঘুম যা ধুলনাত পড়ি।

৩. কেরেংয়ু ধুলনৎ কেরেদা চাক
ন কানিস লক্ষ্মীবুড়া ঘুম যেই থাক।
আলু কচু মিলেইয়ে মাথায়দি দগরে ল্লি বিলেইয়ে।

৪. আলুপাতা তালু রে কুশ্যালপাতা মাইয়ং
ন কানিস লক্ষ্মীবুড়া অলি ডাকে ড্যং।

৫. দারু তুলি জারিফুল না কানিস বাবুধন
রেঙ্গুন সরত্তুন ত বাবে আনি দিব নারেকুল।

সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমাজাতি' (১৯০৯) গ্রন্থে তিন ধরনের চাকমা লোকছড়ার-ঘুমপাড়ানি, বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা ও অর্থহীনছড়া-উল্লেখ আছে। তাঁর মতে, 'যখন আমাদের জ্ঞান নিতান্ত সংকীর্ণ থাকে, সঙ্গীতের বিশ্ববিমোহিনী ক্রীড়া উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য জন্মে না, ততদিন যাবৎ এই ছড়া মাত্র সম্বল লইয়া আমরা প্রাণের উচ্ছ্বসিত আনন্দ পরিব্যক্ত করি।' (ঘোষ ১৯০৯ : ৩৫২) তাঁর সংকলিত ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলো হচ্ছে—

১. আয় চান এলা দে-মেলাদে
ভাঙাকূলা নোয়ান দে
গরুয়ে বিয়াইয়ে ধলডেগা
ধল ডেগায় না খায় দুধ
লক্ষর মাথাৎ সোনার টুপ।

আয় চাঁদ এলাদে মেলাদে
ভাঙা কুলা ন'খানা দে
গরু প্রসব করল সাদা বাছুর
সাদা বাছুরে খায়না দুধ
লক্ষ্মর মাথায় সোনার টোপ।

২. অলি অলি অলি, বাঁশপাতার ঝুলি
বুয্যা বাবা ঘুম যার সোনা ধুলনৎ পড়ি।
সোনা ধুলনৎ রূপার দড়ি
বুয্যা বাবা ঘুম যায় সোনা ধুলনৎ পড়ি।
অলি অলি অলি, বাঁশপাতার ঝুলি
বুড়া বাবা ঘুম যাচ্ছে সোনার দোলনায় পড়ি।
সোনার দোলনায় রূপার দড়ি
বুড়াবাবা ঘুম যাচ্ছে সোনার দোলনায় পড়ি।

৩. আহ্‌দৎ লয়ে বাদোল বাঁশ কুজ্যাৎ লয়ে গুলি
বুয্যা বাবা মারি আনি দিবগৈ বনর পাখী।
হাতে নিয়ে বাটুল বাঁশ কোমরেতে গুলি
বুড়া বাবা মেরে এনে দেব বনের পাখি।

৪. উনদুরে গত্তন কজমজ, বিলেই আঘে বই
বুয্যা বাবা ঘুম যায় সোনার ধুলনাৎ লই।
ইঁদুর করে কিচির মিচির বিড়াল আছে বসে
বুড়া বাবা ঘুম যাচ্ছে সোনার দোলনায় পড়ি।

৫. আলুপাতা তালুরে কুচ্ছ্যাল পাতা লং
যবুনালৈ যবুনি ন এচ্ছ্য লং
ম্যাজাক ছ-গুণে ঘুঁৎ ঘুঁণৎ গরতন্দে
নয়ন ঘর ভিদিয়ে ভালুক কেশ
এ সয়ে বাপমা চলয়ে দেশ।

(গেজেটিয়ার্স-এর ৪নং ছড়ার পাঠান্তর ও সম্প্রসারিত রূপ)

৬. এ কূলে কলাগাছ, ও কূলে ছড়া
পরান্যা বাবা ন কানিজ ভাঙিব গলা।

(গেজেটিয়ার্স-এর ১নং ছড়ার পাঠান্তর)

৭. বাবা বুজ্যা ন কানিজ তুই
বাঙালে কলা মলা আননে লৈ দিম্বৈ মুই ॥

৮. (গেজেটিয়ার্স-এর ৫নং ছড়ার অনুরূপ)

৯. আহ্‌দৎ লয়ে বাদোল বাঁশ কুর্যাৎ লয়ে ম্যাং
বুজ্যা বাবা ন কানিজ অলি ডাগি দ্যং ॥

১০. জাদু ঘুম যারে তুই
পুরান কাল্যা হস্তী এচ্ছ্যে

মাতাই আইয়ম মুই
জাদু ঘুম যারে তুই।

১১. ঘরর পিছে লাল খাগারা মাথার মুথুর করে
হাল্যা ঘরের কাল্যা কুত্তা কেমন কেমন করে
জাদু ঘুম যারে তুই।

আবদুস সাত্তার 'আরণ্য জনপদে' (১৯৬৬, ২য় সং ১৯৭৫) গ্রন্থে ১৪টি চাকমা ছড়া কয়েকটি প্রয়োগরীতি সহ আলোচনা করেছেন। তাঁর 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য' (১৯৭৮) গ্রন্থে পূর্ববর্তী গ্রন্থের চারটি ছড়া সংকলিত হয়েছে।

বিরাজ মোহন দেওয়ান 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' (১৯৬৯, ২য় সং ২০০৫) গ্রন্থে দুটি ঘুমপাড়ানি ও দুটি ছেলেদের ছড়ার উদাহরণ দিয়েছেন। তাঁর সংকলিত ঘুমপাড়ানি ছড়া দুটি হল—

১. হাতে লয়ে বাদোল্ বাশ, কুজ্জদ লয়ে গুলি
লক্ষো বুড়া ঘুম যার, সোনার ধুলনত্ পড়ি।
(সতীশচন্দ্র ঘোষের ৩নং ছড়ার পাঠান্তর)

২. নাক্সা গাছর রিবাং যু, ধুলন বুনি কেরেং যু
কেরেং যু ধুলন কেরেদ চাক, ওয়াং ডগত্তন চিত্তি, চুপ করি থাক।

সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরার 'চাকমা উপজাতির ছড়া ও ছড়াগান' প্রবন্ধটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাঙ্গামাটির 'গিরিনির্ঝর' (জুন ১৯৮৮) সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়। পরে প্রবন্ধটি বিপ্রদাশ বড়ুয়া সম্পাদিত 'পার্বত্য চট্টগ্রামের সাহিত্য ও সংস্কৃতি' (২০০৩) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে সঙ্গীতযন্ত্র সংক্রান্ত সাতটি চাকমা ছড়া এবং অন্যান্য বিষয়ক চারটি ছড়া (সবগুলো বঙ্গানুবাদসহ) সংকলিত হয়েছে। লেখকের 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি' (১৯৯৪) গ্রন্থে পূর্বোক্ত প্রবন্ধে উল্লিখিত সঙ্গীতযন্ত্র সংক্রান্ত চারটি, ছেলেমেয়েদের একটি ছড়া ব্যতীত চাকমাদের বিশ্বাস ও সংস্কার বিষয়ক একটি ছড়া (বঙ্গানুবাদসহ) সংকলিত হয়েছে।

জাফার আহমাদ হানাফী-এর 'উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি (১৯৯৩) গ্রন্থে সাতটি চাকমা ছড়া বঙ্গানুবাদসহ সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে কৌতুকব্যঞ্জক, চিত্রধর্ম ও বৃষ্টি প্রার্থনার একটি করে ছড়া এবং ঘুমপাড়ানি চারটি ছড়া আছে। ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলো হচ্ছে-

১. ওলি ওলি ওলি, বাছপাদা ঝলি
আমাচিত্তি ঘুম যেব সনা ধুলোনত্ গোরি।
(সতীশচন্দ্র ঘোষের ২নং ছড়ার পাঠান্তর ও সংক্ষিপ্তরূপ)

২. উন্দুরে গথনকজর মজর বিলেই দগরে ম্যহং
চিজিবুড়া ঘুম যারে ওলি দাগি দ্যং।
(সতীশচন্দ্র ঘোষের ৪নং ছড়ার পাঠান্তর)

৩. বেং দগত্তন করক্ করক্ ভয্যা বাঝঅ তলে
আমা চিজিত্যায় বৌ আনি দিবং ধুলে দগরে
৪. ত মামু এখে বাজরখুন আনি দিব কলা
ন কানিচরে চিজিধন ভাঙি যেব গলা।

বঙ্কিমচন্দ্র চাকমার 'চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি (১৯৯৮) গ্রন্থে নয়টি চাকমা লোকছড়া সংকলিত হয়েছে।

সুগত চাকমার 'বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য' (২০০২) গ্রন্থে বঙ্গানুবাদসহ বারটি চাকমা লোকছড়া সংকলিত হয়েছে।

চাকমা ঘুমপাড়ানি ছড়াগুলোতে শিশুর মনোরঞ্জনের জন্য অনেক অবাস্তব কথাও বলা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষার ঘুমপাড়ানি ছড়াতে এমনটি আছে। যেমন সোনার দোলনা, রূপার দড়ি ইত্যাদি। রূপকথার কল্পকাহিনীর মত ঘুমপাড়ানি ছড়াতে কল্পলোক রচনা করা হয়েছে। বলা বাহুল্য যে শিশুকে ঘুম পড়ানো হচ্ছে তার কাছে কোনো শব্দের অর্থ নেই। তার কাছে প্রিয় হচ্ছে ছড়ার সুর। মা বা অন্য যে কেউ ঘুম পাড়াচ্ছেন তিনি ছড়া বলে বা গেয়ে নিজেও আনন্দ উপভোগ করছেন, শিশুকেও আনন্দের মাধ্যমে ঘুম পাড়াচ্ছেন। এসকল ছড়ায় সমাজের নানা দিক অনেক সময় রচয়িতার অজান্তেই প্রকাশিত হয়েছে। যেমন রেঙ্গুন শহর থেকে শিশুর বাবা তার জন্য নারকেল এনে দেবেন। ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশের বহুলোক অর্থ উপার্জনের জন্য রেঙ্গুন (বর্তমান নাম ইয়াঙ্গুন) শহরে যেত। চট্টগ্রামের আঞ্চলিক গানেও এর উল্লেখ আছে। (রেঙ্গুন শহরত যাইয়ুম আঁই তোঁয়াল্লায় আইন্যুম কী?)

একটি ছড়ায় আছে গাভী যে সাদা এঁড়ে বাছুর প্রসব করেছে সে দুধ খায় না। এতে সেকালের গ্রামীণ সমাজের প্রাচুর্যের ইঙ্গিত আছে। একটি ছড়ায় বাঙালে (বাঙালি ব্যবসায়ী) কলা নিয়ে আসলে শিশুকে কিনে দেবার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে কলা জন্মে। এক সময় হয়তো ব্যবসায়ীরা অন্যস্থান থেকে কলা এনে বিক্রি করত। পুরানো কালের হাতি এসেছে; তাকে দেখে আসার কথা একটি ছড়ায় আছে।

বৃষ্টির জন্য প্রার্থনামূলক ছড়া বাংলাভাষায়ও আছে। চাকমারা দীর্ঘকাল থেকে এদেশে বসবাস করছেন। কাজেই বৃষ্টির জন্য প্রার্থনামূলক ছড়া তাদের ভাষায় থাকা স্বাভাবিক। আমরা এখনও চাষের জন্য বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। বৃষ্টি প্রার্থনা করে ছড়া ছাড়াও লোকক্রিয়াকলাপ আছে। বিভিন্ন লোককাহিনীতে এর প্রমাণ আছে। চাকমা ভাষায় বৃষ্টির জন্য প্রার্থনামূলক ছড়া প্রচলিত আছে। 'বৃষ্টির অভাবে সারা পার্বত্যভূমি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। শিরীষ সেগুন বনের পাতা ঝরে পড়ছে। কিন্তু বৃষ্টি নামছে না। তখন চাকমা ছেলেমেয়েরা বৃষ্টির ছড়া (Rain invoking) কেটে গড়াগড়ি করছে। গৃহস্থ বৃষ্টির নমুনা স্বরূপ কলসভর্তি পানি এনে তাদের গায়ে ঢেলে দিচ্ছে। ছড়ার বৃষ্টিতে তখন বনভূমি মুখরিত :

দেরে দেবা দেরে ঝড়
গাজর আগায় পানি পড়
কলা গাছকাবি গর দে
মামু দেবায় ঝড় দে। (সাত্তার ১৯৭৫ : ১০৮)

চাকমা শিশুরা খেলার সময় ছড়ার প্রয়োগ করে। অন্যান্য ভাষায়ও লোকখেলার ছড়া প্রচলিত আছে। শিশুরা এসকল ছড়া আবৃত্তি করে আনন্দ উপভোগ করে। কয়েকজন ছেলে বলবে—

চল খুৎখুৎ চল মুঝি
চল কুলা লৈ বেড়ালৈ মুঝি
কাপড়চোপড় ভুদি বান
ও মানিক চান ধুদুগ আন।

এ ছড়ার জবাবে অন্যান্য ছেলেরা আরেকটা ছড়া বলবে—

দিম দিম বিয়ালে
নাক্কোয়া নিল শিয়্যালে
সে নাক্কোয়া কদকদূর
বড় গাং কূলর দখিন কূল
দখিন কূলৎ অরা বাঁশ
ঘর তুলি দিবগৈ আগুন মাস
আগুন মাসের করকত্তি বেং
বাবনা নিল গরুর থেং।

আরেকটা লোকখেলা হল কয়েকজন ছেলেমেয়ে গোলাকার হয়ে মাটিতে বসে সামনে দুটি হাত পৃথকভাবে উপুড় করে রাখবে। একজন এক হাত রেখে অন্য হাতে ছড়ার এক একটা শব্দ বলে এক একটি হাত স্পর্শ করবে। শেষের শব্দ যার হাতে উচ্চারিত হবে সে খেলা থেকে বাদ পড়বে। এ খেলার নাম 'ইজিবিজি খারা'। খেলার ছড়াটি হল—

ইজিবিজি করমা বিজি
মইচ চরে ঘোড়া চরে
সাধু বইয়ে কদু রান
বর্গি উর্ত্তন মনো রাম
এলগা দেলগা রাজা বাবু
কৈয়েদে চুর' আহত্তান কাবি নেজা।

'পৃথিবীতে শিশুরাই সম্ভবত সবচেয়ে বেশী অনুকরণপ্রিয়। বয়স্কদের অনেক চালচলনের চিত্রই তাদের ছড়ার মধ্যে পরিস্ফুট। বাড়িতে তাদের মা খালা ফুফু বা ভাবী বৌদিরা কি প্রকারে ধান ভানে তার চিত্রও ছড়ার মধ্যে বর্তমান। তাই দেখা

যায় দুটি শিশু তাদের উভয়ের দুহাত একত্র করে ধরে আর একটি শিশু এসে সেইখানে পেট রেখে ঢেঁকির আকার ধারণ করে। অবশিষ্ট শিশুরা ঢেঁকি শিশুর পায়ে মৃদু আঘাত করতে করতে ছড়া কাটে :

তেং তিঙরি তেং তিঙরি বাড়া ভান
কার্যাচোলর ভাত দ্বিবা রান,
রান্নে রান্নে চাম্পাফুল, চাম্পা চাম্পা পড়ে
দাদা ভূজি ঘরৎ নেই সোনার নাথেঙা জ্বলে।
ভূজি যিয়ে ভাতচরা দাদা যিয়ে মগপাড়া
দাদার মোঘর দীঘল চুল, বানথে বানথে চাম্পা ফুল
চাম্পা ফুলের তলে দ্বিবা অহ্‌রিণ লড়ে
অহ্‌রিণ নয়, চোঙরা, চোখের পাদা ভোমরা ॥' (সাত্তার ১৯৭৫ : ১০৭)

আরেকটি খেলার বর্ণনা দিয়েছেন বিরাজমোহন দেওয়ান। তিনি লিখেছেন যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একজনের হাতের পিঠে অপর একটি হাত চিমটা কাটার মত রাখা হয় এবং আরও অন্যান্য বালক বালিকারা তাদের হাতও ঐরূপভাবে প্রথম বালক বা বালিকার উপরের হাতের পিঠে অনুরূপভাবে পরস্পর হাতের পিঠে হাত রেখে ছড়া আওড়ায়। ছড়াটি হল—

কবা জাং কবা জাং, নোয়া জুমৎ বা যাং
চাক্ ন খাং ঘিলুক খাং, ফগরা কাবি রিবাংখাং
হা-বা-বা-বা, (বিরাজ ২০০৫ : ১৮৪)

সঙ্গীতযন্ত্র সংক্রান্ত সাতটি চাকমা ছড়ার উল্লেখ করেছেন সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা। চাকমাদের ব্যবহৃত যে সাতটি সঙ্গীতযন্ত্র সম্পর্কে লোকছড়া প্রচলিত সেগুলো হচ্ছে-খেংগরং, বাঁজি (বাঁশি), বেলা (বেহালা), তবলা, ধুদুক, শিঙা এবং ওফিৎ। ছড়া গুলো হল—

১. খেংগরং বেইয়া দিম দিম দিম
তরে ন দিলে কারে দিম
লগে সমায্যা গরি নিম
দিম দিম দাদা, দিম দিম দিম দিম।

২. বাঁজি বেইয়া রু রু রু
দিনে কালে গজ্যে জু
পাগানা দলা গরং সু
রু রু রু বেবেই রু রু রু।

৩. বেলা বেইয়া নে নে নে
যেবেনে ম লগে যেবে নে
বেলা কামিনি ঘরা কেচ
জুরেলে মেইয়া পরা বেচ
নে নে পরানান নে নে নে

৪. তবলা বেইয়া তুম জাঙে
নিশি রেদত ঘুম ভাঙে
নিধর দে গরিয়চ ম নাঙে
তুম জাং, তুম জাং, তুম জাঙে।

৫. ধুদুক নাতুক তুদুক তুক
তেত্রে নাতুক তেত্রে তুক
বাদৈ বদা চিদিরা ধুপ
তুদুক তুক তুদুক তুক
লাগৎ ন পেলে মনৎ দুখ
লাগৎ পেলে মনৎ সুখ
তুদুক তুক তুদুক তুক

৬. ওঁ ওঁ য়েৎতে ওঁ ওঁ য়েৎতে
ও-দা তুই কুদু মুই কুদু
মর দাদু মর বেদু ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ ওঁ।

৭. ওফি ওফি ওফি ও ফি
সর বাগ হুচ্যোগি ও ফি
তর বাগ দুজিবার দেরী কি?
ওফি ওফি ওফি ওফি

[ত্রিপুরা ১৯৮৮ : ৫৫-৫৮)

সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা চাকমাদের লোকবিশ্বাস ও সংস্কার বিষয়ক একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন। ছড়াটি হল :

ঘর তুলিত কয় কুরে, শিমেই তুলা বয় উড়ে
চালত পল্লে চিল শবোন, ঘদত লরিব মন পোবন।
নিঝিরেদর কবা ভাক কারে, উড়ি গেলে তদেক ঝাক।
ছরমা কুগুরে রুংকাল্যে, দিবুস্যা শিয়ালে দোগোল্যে।
সাজন্যা রাদায় ভাক কারে, বারিঝা জনি খুয়া পরে।
পানি খিয়্যা তিরাজে হুয়াং কানিলে বিরাজে
পুরানি চাকমার এ শুল্লুক, ভাঙোন্দি পরিব দেচ মুল্লুক।

(ত্রিপুরা ১৯৯৪ : ৬৬-৬৭)

চাকমা সমাজে প্রচলিত অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লোকছড়া হল—

১. পদ্মাবতী চরণে, আমা বুজ্যা মরণে
ধান তলইবা রাখইয়া নেই
জোগরা কুম্মোয়া খেইয়া নেই।
রাজাপোয়া মর্যন্ দে, কানিয়া নেই।
শনফুল ফুট্যন তুলিয়া নেই। (সাত্তার ১৯৯৫ : ১০৭)

২. কুগুর পুজি আহ্‌দ দবা, আহ্‌দ দবা-ছ নাক দবা
নাক দবা-ছ ভোমরা, লড়েই নিল চোঙরা
ধেল চোঙরা গাং পার ওই
সারেন্দ্‌ কুনাদন্‌ রংকরোই
এক্কোয়া সারেন্দ তিন্নোয়া খিল
তিন্নোয়া খিলৎ তিন্নান্‌ জিল।
কানাই গাঙর দোহরি
ইজে লামে সুর ধরি
বাচ্ছুন কাবি নয় কুড়ি
নয় কুড়ি বাঁঝর তুল্যং ক
ক্যঙে দিলম চেরাগে, দেবায় গল্য পেরাগে
চেরাগর ধুমা লংকালি
উঠো বাজারৎ অং বালি
অংবালি বাজারৎ কি উধ্যে, চিগন চিগন তোবাল্যে ॥ (সাত্তার ১৯৯৫ : ১০৯)

৩. ছরাহ উজানি থুত্তেলেং মাচ, গুজুরি পরে ল্লি বৈঝাক মাস
বৈঝাক মাচ্যা ধান কদাহ, উত্তর ধাক্যা পান কদাহ্‌
কুহজি কুহজি ছিনং পান, পুগেদি উথ্যে পুনংচান
পুনংচানে সাজ ধোর্ল্য, হাঝিদুং মাদেদুং লাজ গোল্য। (সুগত ২০০২ : ৮৮)

৪. দীর্ঘলি বাগৎ চরের মৈছ, সমারে বেড়াদন্‌ ননজ-ভৈজ
দগরের কদুগী ছন-বনৎ, যত কুট্যারি তর মনৎ
পানি খেই ন্যান পনথুন, দখ তুলিজ মনথুন। (সাত্তার ১৯৭৫ : ১১০)

৫. থাচ থুচ থেচ, ত মামু ঘরত যেচ,
ত মামু দিব কুহরা কাবি, চিৎঘিলালই খেচ। (সুগত ২০০২ : ৮৮)

৬. উন্দুরে গরতন্‌ গজরগজর, বিলেই আঘে বই
ও লক্‌করে ডাগগোই, বিলেই মারোককোই
ও ঝাড় বিলেই ঝাড়ত যিয়ে, কুধু পেবগোই। (সাত্তার ১৯৭৫ : ১১১)

৭. কালা কালা হক্কেং, চিদিরা চিদিরা গুই
বুকচিরি গুরা দিলে অ, তুয়ো ন-ডরাং মুই। (সাত্তার ১৯৭৫ : ১১১)

৮. আমপাদা লকখন, তরে মারতে কদক্‌খন।
আহ্‌মত্‌ তলে সমেইলুং বড়ই ফুদেই লুং
বড়ই গাজর তলে, মোমবাত্তি জ্বলে
মুই যেম আগাজত, পানি খেল গলজত্‌। (সাত্তার ১৯৭৫ : ১১২)

৯. সুদত্তুবি সুদত্তুবি, তর বা কই?
লেলম পাদাত চাগোই।
কোয়বো বদা পাজ্যচ? তিন্নুয়া
তম্মা মরিব দিন্নুয়া।
কিঙুরি পার্জ্যচ? কোদেই কোদেই।
তম্মা মারিব ভোগোদেই ভোগোদেই ॥ (সুগত ২০০২ : ৮৬-৮৭)

১০. ইজিবিজি দুধ কাজি
এদে চড়ে মোচ চড়ে, গাভুর ভেইয়া শিঙৎধরে
তা লগে ক্য ন পারে, উধো উধো ভায়ারে
রাজকন্যা নে যায়রে,
ধরে কন্যা বিজুরাম, ফাল্লেই উথ্যে মনুরাম
এলকাত ধেলকাত, রাজাবোয়াই কয়েদে
চোর আহত্তান কাবি নে যা। (ত্রিপুরা ১৯৮৮ :৫৮)

১১. এঘোত তেঘোত তেঘোদ নলা, আরূম জারূম বাঘ নলা।
চাম শিং চোঘোত দিম, লাজুরি কাদা মোঝো শিং। (সুগত ২০০২ : ৮৬)

১২. ঝিকুক্কুক ঝিকুক্কুক, বর বুইয়ার বার্তে শুন নি?
ভেদোল গাঝ থনি, বুরাহ মানঝ্যদর উহ্ল ছিনি যার।
বুরাহ মিলার দুত ছিনি যার, কুন্দি পোরিব কুন্দি পোরিব'
ইন্দি ...ভক্কাই। (সুগত ২০০২ : ৮৭-৮৮)

১৩. এক-ত, দি-ত, তিতিরি তি-ত
কাচ কদম বৈলা নিল, রাজা মোগোর আতঘাত
বামনে নিল সনার তাত, গন্দাগোন্দি উনিচ কুরি। (সুগত ২০০২ : ৮৮)

১৪. জুনি জুনি, ত'ঘর কুনি?
মুরোত্তলে।
ত'পুয়াই ক্যা কানে? বৌয়ে ভাত ন দে।
মারি ন পারচ? বলে ন জিনং।
বলে ন জিনিলে আমক খা। (সুগত ২০০২ : ৮৯)

১৫. মিদিঙা বাঝর চালোনান, তুস পুজিলে পরে
তদাত তলে পরানান, দুগুত দুগুত লরে ॥ (হানাফী ১৯৯৩ : ২৩১)

চাকমা লোকসমাজে প্রচলিত ছড়া খুব বেশি সংগৃহীত হয়নি। যে কয়টি গ্রন্থে ছড়ার উল্লেখ আছে, তাতে দেখা যায়, কয়েকটি ছড়াই ঘুরে ফিরে উল্লিখিত হয়েছে। এখনও গ্রামাঞ্চলে খোঁজ করলে অনেক ছড়া সংগ্রহ করা যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

লোকগীতি

লোকসাহিত্যের মধুর অংশ লোকগীতি বা লোকসঙ্গীত। সুরসংযোগে তাল ও লয়ে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে পরিবেশিত হয় বলে সঙ্গীত সবাই ভালোবাসে। লোকগীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন 'যাহা একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোকসমাজকর্তৃক প্রচারিত হয়, তাহাকেই লোকগীতি (folksong) বলে।' (আশুতোষ ২০০৪:২০৮) চাকমা ভাষায় গানকে বলা হয় গীত। প্রাচীনকালে চাকমাসমাজে গেংখুলী নামে পরিচিত একশ্রেণীর লোক গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এখন তাদের সংখ্যা কমে গেছে। গ্রামাঞ্চলে এখনও গেংখুলীরা গান করেন। তারা যে কেবল ছোট ছোট গানই গেয়ে থাকেন তা নয়, দীর্ঘ পালা গানও-যা কয়েক দিন কয়েক রাত গেয়েও শেষ করা যায় না-তারা গেয়ে থাকেন।

চাকমা গীত সম্পর্কে সতীশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, 'উৎসব আমোদে চাকমাগণ কথকদিগের সাহায্যে সেই পৌরাণিক কাহিনীসমূহ শুনিবার ব্যবস্থা করে। প্রশস্ত স্থানে সভাস্থল সজ্জিত হইয়া থাকে। পরে যথাসময়ে নিমন্ত্রিতগণ সমবেত হইলে, গেংখুলী মহাশয় কোকিল বিনিন্দিত রাগিনীতে সভাজনকে বিমুগ্ধ করিয়া বক্তব্য আরম্ভ করে। নান্দীপাঠ তাহার প্রথম কার্য্য-সভাবন্দন দ্বিতীয়। আখ্যায়িকার উপসংহার হইলে গৃহস্থও উপস্থিত সাধারণের মঙ্গল প্রার্থনা এবং স্বকীয় বিনীত নিবেদন ইত্যাদি করা হয়। এ সময়ে উপস্থিত সকলেই গেংখুলীকে পুরস্কৃত করে, বলাবাহুল্য, অপর সাধারণ অপেক্ষা গৃহস্থের পারিতোষিকের পরিমাণ অধিক থাকে।' (ঘোষ ১৯০৯:৩৩৪)

চাকমাগণ সঙ্গীত ও নৃত্যপ্রিয় জাতি। সারাদিনের ক্লান্তি অপনয়নের জন্য সন্ধ্যার পর তারা গান বাজনায় মেতে ওঠে। চাকমাদের ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত 'উভাগীত'। তরুণ-তরুণীরা সাধারণত এই গীত গেয়ে থাকে। 'প্রাণের আকুল পিয়াসা মিটাইতে প্রায় সকলেই উভাগীতের আশ্রয় লইয়া থাকে। ইহাতে সাধকের হৃদয়োচ্ছ্বাস, উদাসীনের মরমকাহিনী, বিরহীর প্রাণের জ্বালা, প্রেমিকের বিশ্রম্ভালাপ অতি সংক্ষেপে, অথচ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়। এ সকল উভাগীতে প্রায়ই দুই

চরণের অধিক থাকে না। তাহাতেও আবার প্রথম চরণটি মাত্র পদমিলনের নিমিত্ত প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অধিকাংশ স্থলেই পূর্ব ও উত্তরচরণে অর্থগত সম্বন্ধ দেখা যায় না। এবং 'উভাগীত' নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়াই বোধ হয়, গায়কেরা উপসংহারে সুদীর্ঘ 'কুই' (উ-উ-উ-উ) ধ্বনি দিয়া উহাকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ করিয়া লয়।' (ঘোষ ১৯০৯ : ৩৭৯)

সতীশচন্দ্র ঘোষ সংগৃহীত উভাগীতগুলো সংকলিত হল—

১. উদাসভাব

সুপারি কাবি খানে খান
উধে মনখুন নানা গান উ-উ-উ-উ
ছরমা কুরারে কি খুদ দিম
উদাসী মনরে কি বুঝ দিম উ-উ-উ-উ
ছরমা কুরা ন খায় খুদ
উদাসী মনে ন পায় বুঝ উ-উ-উ-উ
দনা উজানি জুনি গেল
পুরানি ভালেৎ দিন উধি গেল উ-উ-উ-উ
মাম্বারা খেইয়া ছাগল্যা
দজ্যাৎ ভাজের পাগল্যা উ-উ-উ-উ

(দনা=প্রায় তিন দিকে পর্বতবেষ্টিত সমভূমি)

এই গানে 'উদাসমনের ভাবই ব্যক্ত হয়েছে। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরের বিরহে অধীর। কেউ কাউকে কাছে পাচ্ছে না। তাদের মাঝখানে না পাওয়া প্রেমই অন্তরে এক অভাবনীয় শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। মনে ব্যথার অন্ত নেই। এসব কারণেই উপরোক্ত গানের মাধ্যমে তারা মনের ভাব ব্যক্ত করছে।' (সাত্তার ১৯৭৫:৯৪)

২. বিরহভাব

মদনা তদেগর ঠুট জ্বলে
রাঙাখাদিয়ে বুক জ্বলে উ-উ-উ-উ
কিজিং ছিরি পক্ষী গেল
ভরন্দি বাজারত লক্ষী গেল উ-উ-উ-উ
চিগন মরিজা টানঙর
দেগিনে স্ববনে কানঙর উ-উ-উ-উ
দগরের বেঙওয়া করকরি
লইয়ে পরানে ধরফরি উ-উ-উ-উ
তোতেক উড়ে ঝাকবদি
রাখিৎ ন পারম থাক বলি উ-উ-উ-উ

এ গানটি সংকলন করে সতীশচন্দ্র ঘোষ মন্তব্য করেছেন, 'প্রেম ভাবাত্মক-গীতে অশ্লীল কথাগুলি অতি সাবধানে বিন্যস্ত হইলেও আদামের (চাকমা ভাষায় গ্রামকে আদাম বলে) মধ্যে কিংবা অনতিদূরে গান করা বয়োবৃদ্ধগণ পছন্দ করে না। কারণ ইহাতে যুবতীগণের চরিত্রভ্রষ্টা হওয়ার আশঙ্কা আছে। প্রেমোদ্ভ্রান্ত যুবকগণ জুমক্ষেত্রে বা বিজন অরণ্যে মনের আকুল আকাঙ্ক্ষা স্বাধীন কণ্ঠে পরিব্যক্ত করে। এ সময়ে প্রণয়িনী ভিন্ন অপর কেহ সঙ্গে থাকে না; অথবা প্রেমিক সম্পূর্ণ একাকীই থাকে। তাহারা কখনও বা গাইয়া বেড়ায়।' (ঘোষ ১৯০৯ : ৩৮০)

৩. বিরহাদিভাব
মাজে খেলো শিল কেই
ন দেলে তরে চিগন বেই
ন পারং থেই উ-উ-উ-উ
বনৎ দগরে হরিংছ
ন দেলে তরে মরিব উ-উ-উ-উ
উড়ের পক্ষী তল চেইয়া
ছাড়ি ন পারিম তর মেইয়া উ-উ-উ-উ
ডিঙি কুলেম্বি ত ঘাদৎ
মর আজল পরান্নান ত আহ্‌দৎ উ-উ-উ-উ
একপণ সুপারি হাজিব
তরে মরেনি ছাজিব উ-উ-উ-উ

চাকমা যুবক যুবতীরা জুম ক্ষেতে একত্রে চাষ করে। ঐ কাজে রত থাকাকালে তারা অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়। মনের আদান-প্রদান করার সুযোগ তখন হয়। তখন যে সব উভাগীত গীত হয় তাতে 'কেবল যুবতীদিগের চিত্ত বিজয়ের নিমিত্ত সন্ধান করা হয়। যুবতীগণ তাদৃশ সম্মোহনবাণে বিমুগ্ধ হইলে, যখন মরমের চঞ্চলতায় সরমের কপাট খুলিয়া যায়, পাল্টা গানে প্রত্যুত্তর প্রকাশ করে। ঈদৃশ সঙ্গীতালাপ অবশ্য যথোচিত সাবধানেই হইয়া থাকে। আবার তাহার ভাষাও কিরূপ সংযত এবং সতর্ক নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীয়মান হইবে। (ঘোষ ১৯০৯:৩৮১)

যুবক : চিগন ছরা চিগন চেই
খুজি ডাগঙর চিগন বেই
ছরাছরি বিল অব
তর আহ্‌ধর পান খিলিক ইল অব'?
যুবতী : ইজরর মাদাৎ বই চান চা গৈ
খাদী মেলি দিয়ম পান খা গৈ
যুবক : ধুন্দা বাজেই ত দি
এধক মাগিলুং ন দিলে
যুবতী : শিল কাঙারা কলে ধর
পরানে মাগিলে বলে ধর

যুবক : শিলর কাঙারা ডর গরে
বলে ধত্তুং লাজ গরে।
যুবতী : মোন ঘরত খেরঝাড়ি
মুই থেইম বেরাঘাজি
যুবক : বেল্যা নিগিল্যে তিদি পেইক
থবাক বাজ্যেমবই নিঝি রেইত
নিঝি রেদোত জাগিবে
ভাবনা থেলে লামিবে।
(শেষ দুই পংক্তি সুগত চাকমার সংগ্রহ)

'চাকমাদের অনেক গানেই প্রতীকধর্মী কতগুলো সংস্কারপ্রিয় উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। গান মাত্রই সুরের মাদকতাস্পর্শে হৃদয়কে অভিভূত করে। এসব গান ও সুরের অপূর্ব মায়াজালে আকাশ-বাতাস আচ্ছন্ন করে ফেলবার ক্ষমতা রাখে।' (সাত্তার ১৯৭৫ : ৯৭)

সতীশচন্দ্র ঘোষ চাকমা সমাজে প্রচলিত একশ্রেণীর দীর্ঘ গীতে বিভিন্নভাবের সমাবেশ লক্ষ্য করে এগুলোকে বিমিশ্র সঙ্গীত নামে অভিহিত করেছেন। এ জাতীয় গীত বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গীত হয়। বিমিশ্র সঙ্গীতের উদাহরণ :

১. দীঘলি বাগৎ চরের মৈছ
সমারে বেরাদন ননন্ ভৈজ।
দগরের কুদুগী ছন বনৎ
যত কুট্যারি তার মনৎ।
পানি খেইন্যাই পনখুন
দুখ তুলিজ মনখুন।
২. বচ্ছি বিয়া পলগে
নোয়া জুম্মান কাবি কলগে
কলগৎ উদিল্ পদনা
তদেগ্ পুঝি মদনা
মদনা তদেগে কধা কয়
ঘাদৎ উজেল্লি সদাগর
মুজুনা মাদি পিচ্ছোলে
ইখুন বেচ গম গরিব ইশ্চরে।
৩. অজল পাগয্যা নীজঝুপ
দিন দিন পরেল্লি কোলিযুগ
কোলিযুগৎ সত্য নেই
বুগচিরি দেগেলে পত্ত্য নেই।
৪. ছরা উযানি তুত্তুলেং মাছ
গুজুরি পরেত্তি বৈঝেগ মাস।

বৈঝেগ মাসেন্দি ধান কাজ
উত্তর ধাগদ্ পানকদা।
কুজিকুজি ছিনং পান
উথ্যে পুগেদি পুনংচান।
পুনংচানে সাজধল্য
আহ্জেদুং মাজেদুং লাজগল্য।

একটি বহুল প্রচলিত প্রাচীন চাকমা প্রেমগীতি বিরাজ মোহন দেওয়ানের 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। গানটি হল—

জুন পর্য্যাত ভুঁই আহ্দে
পরান ন জুড়ায় তুইবাদে
বেল্যা নিগিল্যে তিদি পেখ্
বেরত বায্যেগি নিশিরেত
নিশিরেদত জাগিবে
ভাবনা থেলে লামিবে।

চাকমা লোকসাহিত্যের এক নায়িকা তান্যাবী। তাকে নিয়ে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। তাকে নিয়ে রচিত গানটিকে অনেকেই তান্যাবীর বারমাস বলেন। এতে মাসের কোনো উল্লেখ না থাকায় গানটিকে গীত অধ্যায়ে নিয়ে আসা হল। সুহৃদ চাকমা এটিকে স্নেহপ্রেম মিশ্র সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ছড়ার ছন্দে এটি রচিত। তান্যাবীকে নিয়ে যে লোককাহিনী গড়ে উঠেছে সেটি গান আকারে প্রচলিত। তান্যাবী ছিল খুবই সুন্দরী। রূপই তার কাল হল। 'তাকে নিয়ে গ্রামের যুবক দল কখনও প্রশংসা করত কখনো বা দুর্নাম ছড়াত। এভাবে তান্যাবীর জীবন বিষময় হয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে কমলধন নামে এক মৃতদার ব্যক্তিকে বিয়ে করতে হয় এবং তারপর আত্মহত্যা করে মরতে বাধ্য হয়।' (ত্রিপুরা ১৯৮৮ : ৬০) অজ্ঞাতনামা কবি তান্যাবীকে নিয়ে যে গানটি রচনা করেছেন তা নিম্নরূপ :

আরে নাদিন তান্যাবী
তুল্যা সাঙু পারি দিলে কার লাগি।
তান্যাবী গাঙত যায় মাজি আনে সনার থাল
রজে ভার পুরা ঐয়ে বেই তান্যাবীর যুবককাল।
তান্যাবীয়ে উড়ে পিনে তেলদি মাদা আজুরে
তার যৌবনে পাগল ওইয়ন সে আদামর গাভুরে।
তান্যাবীয়ে পান খায় মধু যষ্ঠী মোম গরে
কুকি ছড়ার আড়িংপান আনি দেদন গাভুরে ॥
তান্যাবীয়ে ভাত রানে গালি ফেলেই ভাদমু
তান্যাবীর অসুখ এলে বেক গাভুরলক চুধামু
তান্যাবীয়ে ভাত খায় ইত্তুক ইত্তুক উলুতোন
গাভুর লগে ন খেই খাবায় ব্যাক্কুনয় তে গোরাবোন।

তান্যাবীয়ে ধুনদা খায় দাবা মাদে পদোলত
মদরজি ভরেই থইয়ে ধুপ ফটিগর বদলত।
তান্যাবীয়ে পান খায় পানলগে বত্তাছাল
গাভুর লগে বাজেই ফেল্যন তান্যাবীরে মেইয়া জাল।
তান্যাবীয়ে বেন বুনে বেনওলে বদলা
তান্যাবীরে ধরি নিবাক কেরেতকাবা মোনতলা।
তান্যাবীয়ে ফুল তুলে আলামুত্তুন ছাবাং গাঝ
বৌচা এলে কধাদিদং ও তান্যাবী কেনযান পাস্ ॥
তান্যাবীয়ে বারা বানে কুলাপিদৎ তালরাগায়
বৌচা এবার কধা কলে তামমারে তে চোক পাগায়।
তান্যাবীয়ে গাঙৎ যায় কত্তিবোয়া থয় ধুপ গরি
গাভুরলগে খাপদি আঘন খাগারা দুবৎ চুপগরি।
তান্যাবীয়ে বুর মারে সেপ্পুয়া দিনেই যুচং গরি
ইজা মাজে ধাবা এত্তন তান্যাবীরে লোভ গরি।
তান্যাবীয়ে সাজুরে বুগত্তলে খুম দিনেই
গাভুর বুড়া মূর্চ্ছা খেই জান অমগদ দোল কেইনেই।
তান্যাবীয়ে সুদা কাদে চড়কাৎ দিল মালঘরা
চম্বাফুলর বাস নিগিলে রুবে রঙে দলঘরা।
তান্যাবীয়ে বিছানাৎ যায় খাদিত গোঝেই খেংগরং
তালে তালে নাজি উদে স্বর্গরাজা ইন্দোরং।
তান্যাবীয়ে ঘুম যায় টাঙেই ফুল মজরী
তান্যাবীয়ে চেদ যেইয়ে হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী।
তান্যাবীয়ে বেইন্যা উধে কাবরচোবর সোরগরি
গোঝেনত্তুন বর মাগেত্তে আজং আজং মু গরি।
তান্যাবীয়ে বেড়েদো যায় কট্টাদিল মত্যবিল
তাকুটুম্ব ইদু গেল জ্ঞাতি গোত্তি চেগোহিল।
তান্যাবীয়ে ফিরি এল ঘর কামত দিল মন
তান্যাবীরে বৌ চা এইচ্যে বুড়িঘাদর কমলধন।
তান্যাবীয়ে কধা শুনি মনে মনে কানে
বৌ দিবাত্যেয় কধা দিলাক তার বাবে আর মায়ে।
তান্যাবীয়ে রান্যাত যায় শুগরি দাদি টানেল্লাই
পুরানকধা ইধৎ তুলি গুজরী গুজরী কানেল্লই।
তান্যাবীয়ে ফল চারায় দোলে দোলে চাঙান দি
গাভুর লগে পুজার গত্তন বৌ চা লবেক ভাঙন্দি।
গাভুর দাদা বারেং বুনে দোলে দালে কুন ভাঙে
আজল কধা কধ' গেলে সংগী ভেইয়র মন ভাঙে।

তান্যাবীয়ে রান্যাৎ যায় রানি খায়গৈ কলা গাছ
তান্যাবীয়ে কুরে যেই ন পারে ভুরং ভুরুং পজা বাস্।
তান্যাবীরে ছড়া ইজে দিন্নোয়া ইজে এক কুরুম
তান্যাবীরে দোল দোল কন্দে পুনে মাধায় এক সুরুং।
তান্যাবীয়ে জুম ছুলে চাড়ি মাধায় খুত্তোয় যায়
তান্যাবীয়ে কাম্মোয়া কন্দে উঠতে বচ্তে দিন্নান যায়।
তান্যাবীয়ে ঘরত্ এযে চুদোয়া বুগি বারেঙুয়া
ফাল্লেই ফাল্লেই ধাবা এলে ছলা খেইয়া হরিঙুয়া।
তান্যাবীয়ে পিনন পিনে নেইয়ত গুজেই চাবোগী
লজ্জা শরম ন চিনে তে দুগর কধা কবগী।
তান্যাবীয়ে ঘুম যায় তেল্যাপুগে ঘুরকারে
সংসমায্যা ঘুমত পরলে ভাত তরকারী চুর গরে।
তান্যাবীয়ে বেন বুনে বেনত্তলে ঠুরচুমা
অজা জুবো কনমদে ফুলতুলানা তার ঠুমা।
তান্যাবীয়ে গাঙৎ যায় খাদিত্তলে মাচ্ছে শিল
ভরণ পিরন কন্দে তারে কাবর খোল্লে কাত্তোয়া চিল।
তান্যাবীয়ে মান্যা গরে কদলপুরত যেবাত্ত্যায়
গাঙুর মদ্দ লগে তিন্নাং ফাল্ল্যাং অবাদ্যায়।
তান্যাবীয়ে চুল আঁজুরে উগুন কালা খাদি পেস
তান্যাবীত্তুন চুল আঘে কন ছাগলদাড়ি সিত্তুন বেস।
তান্যাবীয়ে ঘরৎ যায় ইজোর জগা কুম পিলা
তান্যাবীয়ে দোল দোল কন্দে রাজার ঘাদর ডুম মিলা।
তান্যাবীয়ে কধা শুনি মনে ভাবে ঘনঘন
গাবুর লগরএ ভাঙন্দি ন শুনিল কমলধন।
তান্যাবীয়ে কধা কয় নরম পাদল উত্তানি
তান্যাবীয়ে এযের শুনি ধরাবানা ব্যাক্কানি।
তান্যাবীয়ে বৌ যেবার মন্নন এ বেল গল্য দোল
কুড়ি তারিখ মাঘ জারত কমলধন লই মিলন ওল।
গাভুর দাদা পেইক পুজে পেনজুরাত্তুন কের কেরায়
এমন সময় উড়ি যেইয়ে কানের দাদা তার পড়ায়।

বাংলা অনুবাদ
ওরে নাতিন তান্যাবী
উঠানো সাঁকো নামিয়ে দিলে কার জন্যে।
তান্যাবী গাঙে যায় মাজি আনে সোনার থাল
রসে ভরে পূর্ণ হয়েছে বোন তান্যাবীর যৌবনকাল।
তান্যাবীর উড়ে পিনে (কাপড় ওড়ে) তেল দিয়ে মাথা আঁচড়ায়
তার যৌবন দেখে পাগল হয়েছে সেই গ্রামের যুবকদল।

তান্যাবীয়ে পান খায় মধুযষ্ঠী মুখে দেয়
কুকিছড়া থেকে আড়িং পান (বড় পান) এনে দেয় যুবকেরা।
তান্যাবীয়ে ভাত রাঁধে ভাতের ফ্যান ফেলে দেয়
তান্যাবীর অসুখ হলে যুবকদের মুখ কালো হয়।
তান্যাবীয়ে ভাত খায় একটু একটু চালিতার তরকারি দিয়ে
যুবকেরা না খেয়ে (তাকে) খাওয়ায় সবার সে ছোট বোন।
তান্যাবীয়ে তামাক খায় দাবার শব্দ হয় পদোলত (গুড়ুক গুড়ুক)
মদের রস ঢুকিয়ে রেখেছে সাদা ফটিকের বোতলত।
তান্যাবীয়ে পান খায় পানের সাথে খয়ের-গাছের ছাল
যুবকদের আটকিয়েছে তান্যাবীর মায়াজাল।
তান্যাবীয়ে কাপড় বোনে তাঁতের নিচে ব (সুতোর) দলা
তান্যাবীকে ধরে নিয়ে যাবে কেরেত কাটা পাহাড়ে।
তান্যাবীয়ে ফুলে তোলে আলাম (নক্সাকাপড়) থেকে ছাবাগাছ
বৌ দেখতে এলে কথা দেবো ও তান্যাবী কি মনে করো?
তান্যাবীয়ে ধান ভানে কুলার পিঠে তাল রাখে
বৌ দেখতে আসার কথা বললে তার মাকে সে চোখ পাকিয়ে চায়।
তান্যাবী নদীতে যায় কত্তি (পানি খাওয়ার পাত্র) টা রাখে পরিষ্কার করে
যুবকেরা অপেক্ষা করছে খাগড়া ঝোঁপে চুপ করে।
তান্যাবী ডুব দেয় গায়ে থুতুর ফোঁটা দিয়ে
চিংড়িমাছ ছুটে আসে তান্যাবীকে লোভ করে।
তান্যাবীয়ে সাঁতার কাটে বুকের নিচে কলস দিয়ে
যুবক বৃদ্ধ মূর্ছিত হয় অতিরিক্ত সুন্দরী বলে।
তান্যাবীয়ে সুতা কাটে চরকাতে দিয়ে মালঘরা
চাঁপাফুলের গন্ধ বের হয় রূপে রঙে যেন সাদাঘোড়া।
তান্যাবী বিছানায় যায় খাদিতে (বক্ষবন্ধনী) রেখে খেংগরং (বাদ্যযন্ত্র)
তালে তালে নেচে ওঠে স্বর্গের রাজা ইন্দ্র।
তান্যাবী ঘুম যায় ফুলের মশারী খাটিয়ে
তান্যাবীরে দেখতে গেছে হরিশ্চন্দ্র চৌধুরীয়ে (চাকমা রাজা)।
তান্যাবী সকালে উঠে কাপড়-চোপড় ঠিক করে
গোঁসাই (ভগবান)-এর কাছে বর চায় হাসি হাসি মুখ করে।
তান্যাবী বেড়াতে যায় পাড়ি দিল মস্তবিল
তার আত্মীয়ের কাছে গেল জাতি গোষ্ঠী চেগোহিল।
তান্যাবী ফিরে এসে ঘরের কাজে দিল মন
তান্যাবীকে বৌ দেখতে এলো বুড়িঘাটের কমলধন।
তান্যাবীয়ে কথা শুনি মনে মনে মন কাঁদে
বৌ দেবার কথা দিল তার বাবা আর মায়ে।

তান্যাবী রান্যাত (পুরাতন জুম) যায় মিষ্টি কুমড়ার লতা টানতে
পুরাতন কথা মনে তুলে শুরু করে অঝোরে কাঁদতে।
তান্যাবীয়ে ফল গাছ রোপন করে ভালো করে মাচান দিয়ে
যুবকেরা প্রচার করছে বৌ চাওয়ার সময় দুর্নাম দিয়ে।
জোয়ান দাদা বারেং (বড়ঝুড়ি) বোনে ভাল করে কোণা ভেঙে
আসল কথা বলতে গেলে সঙ্গী ভাইদের মন ভাঙে।
তান্যাবীয়ে রান্যাৎ (পুরাতন জুমে) যায় রেঁধে খায় কলাগাছ
তান্যাবীর নিকট যাওয়া যায় না ভুরভুর করে পঁচা গন্ধ বের হয়।
তান্যাবীরে ছড়া সেঁচে সারাদিন সেঁচে এক কুরোম (ছোট ঝুড়ি)
তান্যাবীরে সুন্দর বলা হয় কিন্তু আগাগোড়া (পায়ে মাথায়) একই রকম।
তান্যাবীরে আগাছা নিড়ায় কাচি শুধু লাগিয়ে যায়
তান্যাবীকে কাজে বললে উঠতে বসতে দিন চলে যায়।
তান্যাবী ঘরে ফিরে শূন্য বারেং (বড় ঝুড়ি) মাথায় নিয়ে
লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়ে আসে যেন আঘাতপ্রাপ্ত হরিণটি।
তান্যাবী পিনন পরে নাভিতে গুঁজিয়ে চাবোগী (নক্সাটি)
লজ্জা শরম চিনে না সে দুঃখের কথা বলব কী।
তান্যাবী ঘুম যায় তেলাপোকায় নাক ডাকায়
সঙ্গীরা সব ঘুমিয়ে পড়লে ভাত তরকারী চুরি করে।
তান্যাবী কাপড় বোনে তাঁতের নিচে থুরচুমা (যে চোঙায় সুতা থাকে)
ফুল তোলার মধ্যে কোন মতে অজাজোবোয়া (প্রাথমিক) সে তুলতে পারে।
তান্যাবী নদীতে যায় খাদির নিচে মাচ্ছোয়া শিল (পাললিক শিলাখণ্ড)
হৃষ্টপুষ্ট বলে তাকে কিন্তু কাপড় খুললে যেন শুকনা চিল।
তান্যাবী মানস করে কদলপুর (মন্দিরে) যাওয়ার জন্য
যুবকদের সাথে সাথে টানা হেঁচড়া হওয়ার জন্য।
তান্যাবী চুল আঁচড়ায় খাদির আঁচল ভর্তি উকুন কালো হয়ে থাকে
তান্যাবীর চুল আছে বলে অথচ ছাগলের দাড়ি তার থেকে বেশি থাকে।
তান্যাবী ঘরে যায় ইজোরের (ঘরের সম্মুখস্থ মাচান) কলস ভর্তি সর্বত্র
তান্যাবীকে সুন্দরী বলে সবাই কিন্তু সে যেন রাজার হাটের ডোমের মেয়ে
তান্যাবী এসব কথা শুনে মনে মনে ভাবতে থাকে
যুবকদের এই ভাঙানিয়া কথা কমলধন শুনল না।
তান্যাবী কথা বলে নরম পাতল ঠোঁট দিয়ে
তান্যাবী হাসছে শুনে চুক্তির কাজ সম্পন্ন হল।
তান্যাবী এবার বৌ হয়ে যাবে মনটা তার হল সুন্দর
মাঘ মাসের বিশ তারিখে কমলধনের সাথে মিলন হল।
যুবক দাদা পাখি পোষে পিঞ্জর থেকে কিচির মিচির করে।
এমন সময় উড়ে গেছে কাঁদে দাদা তার পোড়ায় ॥

(অনুবাদ : সুরেন্দ্রলাল ত্রিপুরা)

চাকমা লোকগীতি এখনও জনপ্রিয়। বিশেষ করে উভাগীত চাকমা লোকসঙ্গীতের একান্ত নিজস্ব ধারা। বাংলা কিংবা অন্য কোনো ভাষায় এ জাতীয় সঙ্গীত নেই।

বাংলায় কর্ম সঙ্গীত নামে এক শ্রেণীর সঙ্গীত আছে। অনেকে এটাকে শ্রমসঙ্গীতও বলে থাকেন। বাংলা কর্মসঙ্গীত হিসেবে নৌকা বাইচের গান, কৃষিকাজ করার সময় কৃষকের গান, তাঁত চালানার সময় তাঁতিদের গান, ছাদ পিটানোর গান, কাঠ চেরানোর সময় বা কাটা গাছ সরানোর সময় গীত গান এর উদাহরণ। কর্মের প্রত্যক্ষ প্রেরণা বা শ্রম লাঘবের জন্য এ গান গীত হয়ে থাকে। কর্ম সঙ্গীত কর্ম করার সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে অধিকাংশ স্থলে সম্মিলিতভাবে গীত হয়।

চাকমা সমাজে প্রচলিত একটি কর্মসঙ্গীতের উদাহরণ দিয়েছেন সতীশচন্দ্র ঘোষ। তাঁর ভাষায় 'পাহাড়ী জুমিয়াদের বিশেষত যাহারা কাট্টন করে অর্থাৎ কাঠ বা নৌকা কাটে, তাহাদিগের প্রায় নিত্য প্রয়োজনে আইসে। গাছ টানিতে ও তুলিতে সুরলয়যোগে ইহার আবৃত্তিতে বড়ই জোর পাওয়া যায়। ইহা একদিকে যেমন উৎসাহ বৃদ্ধি করে, অপর দিকে তেমনই সুর লয়ে সকলেরই বল যুগপৎ নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। সুতরাং এই ছড়ায় সহজেই অল্প বলে অধিক কাজ আদায় করা চলে। ইহাতে দলপতি দলের সকলকে সাবধান পূর্বক উত্তেজিত করিয়া 'ডাক' বলিতে থাকে; আর তাহারা একযোগে প্রত্যেক ডাকের সঙ্গে সঙ্গে হেইয়া হেইয়া বলিতে বলিতে বল প্রয়োগ করে। (ঘোষ ১৯০৯ : ৩৫৬) সতীশচন্দ্র ঘোষ এই কর্মসঙ্গীতটিকে 'কাট্টনের ডাক' নামে পরিচিত করেছেন। কর্মসঙ্গীতটি নিম্নরূপ :

ধররে ধর, বাবা সকল, ভাইয়া সকল
ধররে ধর, জোর করিয়া সমান করিয়া
মারে মা;
তোর পুতে ডাকে, শুনছ না?
শুনিয়া পুত করিম কি?
ধীরে ধীরে চলেছি।
চল সুন্দরী হাতের তাড়
জাঙ্গাল বাইয়া বধুঁয়া যার।
বধুঁয়া দেখি লাজে মরি
মারে মা কি যে করি।
লাজ পায় লি বাজারৎ ঘর,
একদিন গম থাই দুদিন জ্বর।
চল সুন্দরী করি মন
আমরা খাইতাম সাউধের ধন।
আল্লার বরে নবীর বরে
সাতালি পর্বত ডাকৎ লড়ে।
ডাক শুনাইতে আনলাম গাভুর
গাভুরের ডাকৎ নাইকো সুর।

আনলাম গাভুর বাছি বাছি
ছিঁড়ি ফেলে দে লোহার কাছি।
লোহার কাছি ন ধরে টান
আলগুর কাছি পাকাইয়া আন।
জোরের জঙ্গী
মাথার ভঙ্গী
ভঙ্গী লাজে
ঘুম ন আইসে ফাউঝা বাজে
বীর হনুমান
গন্ধমাদন উঠাইয়া আন
হনুর বেটা ভানুর নাম
খারু গড়াইদে নাইয়র যাম
খারু বেচি লাড়ু খাম
লাড়ু লইয়া সহরৎ যাম।
জোরের কাম
পড়ের ঘাম
ঘামের ঘুম
সুন্দরী গালে কে দিল চুম?
রস্যার গালে কে দিল চুম?
হায়রে হায়
হায় বোলায়
গা ঢুলাইয়া হায় বোলায়। (ঘোষ ১৯০৯ : ৩৫৬-৫৮)

'কাট্টনের ডাক গানটির শক্তিগুণ অপূর্ব। তাছাড়া এতে প্রতীকধর্মী এমন কতকগুলো শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেগুলো শক্তির দ্যোতক এবং উদ্দীপনামূলক। শেষের দিকে কিছুটা অশ্লীলতা থাকলেও তা কৌতুকব্যঞ্জক এবং রসাত্মক। এই অশ্লীলতাপূর্ণ লাইন দুটিতে কিছুটা যৌন আবেগের স্পর্শ আছে। মনে হয় কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে এই আবেগধর্মিতাই অধিকতর উৎসাহের সৃষ্টি করে। গানটির রচয়িতা কে বা কারা তা অজানা থাকলেও রচয়িতা যে বেশ কাব্যগুণের অধিকারী এবং রসিক তা সহজেই অনুমান করা যায়।' (সাত্তার ১৯৭৫ : ১১৬)

চাকমা লোকসঙ্গীত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই গান সংগৃহীত হচ্ছে না। এখনই সংগৃহীত না হলে তা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। বাংলা আধুনিক গানের পাশাপাশি প্রাচীন লোকসঙ্গীত এখনও গীত হয়। আধুনিক চাকমাগানও সমৃদ্ধ। কিন্তু সেই গানের পাশাপাশি প্রাচীন লোকসঙ্গীত চর্চা তেমন হচ্ছে না। উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট চাকমা লোকসঙ্গীত সংগ্রহ ও সংরক্ষণে ব্রতী হবেন এ প্রত্যাশা আমাদের।

বারমাসী

লোকসাহিত্যের বিশাল ও উর্বরক্ষেত্র লোকসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীতের একটি উজ্জ্বল অংশ বারমাসী গান। প্রেম বিরহসহ জাগতিক কোনো অনুভূতি বারমাসের বর্ণনার মাধ্যমে যে সঙ্গীতে প্রকাশিত হয় তাকে বারমাসী বলে। অধিকাংশ বারমাসীতে প্রোষিতভর্তৃকার মনের আর্তি বর্ণিত হয়েছে। দয়িতের কথা চিন্তা করে নায়িকা বারমাসের প্রতিটি মাসে তার দুঃখ প্রকাশ করে থাকে। (শর্মা ২০০২:১)। 'সুখেরই হউক, দুঃখেরই হউক, বারমাসীর ভিতর দিয়া নারী হৃদয়ের অকপট অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হওয়াই উদ্দেশ্য। ...বারমাসী নায়িকার নিজস্ব মনোদর্পণ তাহার জীবনের সুখদুঃখের অনুভূতির চিত্রগুলি সেখানে একান্ত প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে; ইহা তাহার নিভৃত আত্মবিশ্লেষণ মাত্র। ইহার কোন শ্রোতা থাকে না; থাকিলেও সেই শ্রোতা নায়িকার প্রিয়তম ও একান্ত বিশ্বাসভাজন ব্যতীত আর কেহই হইতে পারে না।' (আশুতোষ ১৯৭০; ৫০১-৫০২)।

বিরহিনী নায়িকার আর্তি বারমাসীর বিষয়বস্তু হলেও একমাত্র বিষয়বস্তু নয়। বারমাসের সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বর্ণনাই বারমাসী। নারী মনের আর্তি ছাড়াও বারমাসী রচিত হয়েছে। বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনার পাশাপাশি আন্তঃপ্রকৃতির বর্ণনাও এতে প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে 'ঋতু শাসিত কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনেও পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তন একই সঙ্গে বাহ্যিক ও মানসিক। প্রকৃতির এই পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে লোকসমাজের বিচিত্র মনোভাব অবলম্বন করে রচিত হয়েছে বারমাসী গান।' (অমলেন্দু ১৯৮৪ : VII)

বারমাসী লোকসমাজে খুবই জনপ্রিয়। একই গানের বারমাসী বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যে সকল অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হয়েছে সেই অঞ্চলের ভাষারীতি বারমাসীর অঙ্গে লিপ্ত হলেও কাঠামো পরিবর্তিত হয়নি।

চাকমা লোকসাহিত্যে বারমাসীকে 'বারমাচ' বা বারমাস বলে। 'বঙ্গীয় ললনাগণ বারমাসের উপর্যুপরি লাঞ্ছনায় ঝালাপালা হইয়া মনের উচ্ছ্বাসে বারমাস জুড়িয়া দিতেন। এই সকল হিন্দু অবলার বারমাসও চাকমা সমাজে যথেষ্ট আছে সত্য, কিন্তু তাহাদের নিজস্বও কম নহে। 'কির্বাবির বারমাস', 'শেষ্যোয়া কন্যার

বারমাস', 'তান্যাবির বারমাস', 'রঞ্জনমালার বারমাস', 'কালিন্দীরানীর বারমাস' ইত্যাদি কতই আছে।' (ঘোষ ১৯০৯ : ৩৪৬)।

সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমাজাতি' গ্রন্থে 'কির্বাবির বারমাস' সংকলিত হয়েছে। এর ভাষা মূল চাকমা ভাষার তুলনায় বহুপরিমাণে মার্জিত; বলতে গেলে বাংলা। এর পাত্রপাত্রী পরিবেশ সবই চাকমা সমাজের। মনে হয় মূল চাকমা ভাষায় রচিত 'কির্বাবির বারমাস' লোকমুখে বহুল প্রচারের ফলে এর ভাষা বাংলার কাছাকাছি এসেছে। সতীশচন্দ্র ঘোষের মতে এটি আধুনিক যুগে রচিত, মূল রচনাটি তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি। শতবর্ষ পরে এখনও এটি সংগৃহীত হয়নি। কিন্তু শ্রীঘোষ স্বীকার করেছেন 'বারমাসখানির প্রতি পঙক্তিতে চাকমাদিগের জাতীয় কাহিনী নিহিত আছে' (ঘোষ ১৯০৯ : ৩৫২)। বিরাজমোহন দেওয়ান তাঁর গ্রন্থে স্বীকার করেছেন 'পল্লীকবিদের রচিত বারমাসীদ্বারা চাকমাজাতির লোকসাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী। সাধারণত লাবণ্যময়ী পল্লীললনার প্রণয়ঘটিত কাহিনীকে ভিত্তি করিয়াই ইহা রচিত হয়। তাহাতে যে সমস্ত ভাবধারা সমাবেশিত হইয়া থাকে, তাহা সমগ্র বিশ্বর মানবসমাজেরই মূর্ত প্রতিচ্ছবি।' (বিরাজ ২০০৫ : ১৯৯) তিনি মেয়াবীর বারমাস সংকলন করেছেন। কির্বাবির বারমাস বা অন্য বারমাস সম্পর্কে কিছু লিখেন নি।

আবদুস সাত্তার বলেছেন, 'চাকমা লোকসংস্কৃতির আরেকটা উল্লেখযোগ্য নজীর হলো বারোমাসী। আর এসব বারোমাসী বিরহসঙ্গীতের নামান্তর। প্রেমিকের অভাবে বিরহিনী নারীর বারোটি মাস কি করুণ পরিবেশে অতিবাহিত হয় তার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা স্থান পেয়েছে বারোমাসীতে। বারোমাসীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো পরিবর্তমান প্রাকৃতিক পটভূমিকার সঙ্গে যোগ থাকে বিরহিনী নারীর মনের অবস্থার এবং একে সার্থকভাবে রূপ দেওয়াই বারোমাসী রচয়িতার আসল বৈশিষ্ট্য। অন্যথায় সে সব বারমাসী না হয়ে সাধারণ সঙ্গীতেরই রূপলাভ করে।' (সাত্তার ১৯৭৫ : ৯৭)। 'আরণ্য জনপদে' গ্রন্থে আবদুস সাত্তার সতীশচন্দ্র ঘোষ সংগৃহীত কির্বাবির বারমাসের কিয়দংশ সংকলন করেছেন। কির্বাবির বারমাসের নায়িকা কির্বাবি ও নায়ক আতুরা প্রেমের টানে গৃহত্যাগ করেছে। 'এতে শুধু গতানুগতিক বর্ণনাবাহুল্য নেই; মাঝেমাঝে কবিত্বময় বর্ণনাও পাঠকের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে।' (সাত্তার ১৯৭৫ : ১০০) কির্বাবির বারমাস-এ বছর শুরু হয়েছে কার্তিক মাস থেকে। এটি বারমাসীটির প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। কারণ প্রাচীন বাংলা বারমাসীতেও এরূপ দেখা যায়। উত্তরকালের বারমাসীতে (বাংলা ও চাকমা) বর্ণনার ক্ষেত্রে বৈশাখ মাস প্রথমে এসেছে।

সুহৃদ চাকমার মতে, 'বারমাসী চাকমা জাতির লোকসাহিত্যের একটা অঙ্গ। লাস্যময়ী লাবণ্যময়ী, সহজ সরলা পল্লী ললনাদের প্রণয়ঘটিত কাহিনী অনুধাবন করে পল্লীকবিরা অত্যন্ত মধুর সাবলীল গীতিমাধুর্য ভাষায় রচনা করেন।' (সুহৃদ

২০০৪ : ১৫৪) তিনি কির্বাবি, মেয়াবি, তান্যাবি, রঞ্জনমালা ও সাননোবী বারমাসের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'চাকমা সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে তিনি সান্দবী (চান্দবি) বারমাসী, কালেশ্বরী বারমাসী, মেয়াবি বারমাসী, তান্যাবির বারমাসী ও মা-বাব বারমাসী সম্পর্কে আলোচনা করলেও কির্বাবির বারমাসীর আলোচনা করেন নি। নাম উল্লেখ করেছেন মাত্র।

সুগত চাকমার 'বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে তানাবি, রক্তবী, যুদ্ধপদি, কির্বাবি ও মেয়াবি বারমাসীর উল্লেখ আছে এবং বঙ্গানুবাদ সহ তান্যাবির বারমাসীর অংশ বিশেষ সংকলিত হয়েছে। সতীশচন্দ্র ঘোষের বইটি এখন দুর্লভ বলে তাঁর সংগৃহীত বারমাসীটি সংকলিত হল :

কির্বাবির বারমাসী
কার্ত্তিক মাসেতে কির্বা বৃক্ষপত্র ঝরে
ধর্ম ফলে জন্ম হৈল সুন্দরী[১] বাপের ঘরে।
পুত্রের সমান করি মায়ে বাপে পালে
হেন দুঃখ দিল কির্বা শরীর অন্তরে।
হেন মতে পালে যেন কন্যা রত্নমালা
দিনে দিনে বাড়ে যেন পূর্ণ চন্দ্র কলা।

আগ্রণ মাসেতে কির্বা কুরঙ্গ নয়ানী
কান দুটি বরুণ তার ক্ষীণ মাজাখানি।
চন্দ্রের সমান মুখ নাসিকা তিল ফুল
দেখিতে সুন্দর (অঙ্গ) কন্যা রতনের মূল।
খঞ্জন গমনে হাঁটে কির্বা চন্দ্রমুখী
গৃধিনী সাবাশে কর্ণ ক্ষীণ মাজাখানি।

পৌষ মাসেতে কির্বা শীতে পরে ধারে
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন দিনে দিনে বাড়ে।
আতুরা জন্মিল যদি লক্কনের ঘর
কির্বাবির মিলনকথা শুন সর্বনর।
খারিকাবা নদী ছিল পূর্বে আর উত্তরে
দৈবযোগে গেল কির্বা সেই নদী তীরে।
সেই দিন আতুরার সঙ্গে দরশন
দুই জনে যুক্তি করি প্রবেশিলা বন।

মাঘ মাসেতে কির্বা মনে করি সার
....
দুই জনে কৌতুক করি দিল আলিঙ্গন
কতদিন ভ্রমিয়া কন্যা জঙ্গল মাঝার
ঘরেতে আসিল কন্যা লোকেতে প্রচার।

আমুলুকে মিলি করি যুক্তি করি সার
বাড়াইয়া দিল কন্যা ঘরে আপনার।

ফাল্গুন মাসেতে কির্বা ফাউ[২] খেলে দোলে
ত্রিপুরাছুরী দুয়ারে নিল সালিশ করিবারে।
প্রভাতে বসিয়া কন্যা উঠিল দঢ় হইয়া
জয় খিসা[৩] হুকুম দিল কন্যা দেগৈ[৪] বিয়া।
সর্বলোকে মিলি যদি বিয়া দেগৈ কোইল
জয়চন্দ্র খিসা উঠি কিছু না বলিল।
বহুমূল্য ধন দিয়া তুলি নিল বাপে
রহিতে ন পারে কির্বা মনের অনুতাপে ॥

চৈত্র মাসেতে কির্বা রৌদ্রতে হরান[৫]
বুঝাইতে নাহি পারে কন্যার পরান।
ভীমসুত গলে গিয়া জলেতে গমন
তবে সে পাইব আমি প্রভু দরশন।
রামেরে হারাইলা যদি সীতা মহাদেবী
সেই মতে হারাইল কির্বা গুণনিধি ॥

বৈশাখ মাসেতে কির্বা বৈসে তরুমূলে
ছাড়িবারে না পাইলুম প্রভুর মায়াজালে।
রহিবারে না পাইলুম ভাই বন্ধু ঘরে
নিত্যনিত্য কৃষ্ণসুতে দহে রাত্রি দিনে
কেমনে ছাড়িয়া গেল কন্যা সুবদনে।

(ত্রিপদী)

অষ্টসীতা বলে পুনি কোথা যাব সুবদনী
তত্ত্বকথা কহি শুন সার
কন্যা বলে সুবদনী নিবেদন করি আমি
সত্যিকথা কহি শুন আর।
জ্ঞাতিবন্ধু ঘরে রৈলুম বহু দুঃখ মনে পাইলুম
শুন প্রভু করি নিবেদন
অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া অনলেতে প্রবেশিয়া
তবে প্রভু পাব দরশন।
আদি চন্দ্র নিজচন্দ্র উলমন্থ চন্দ্র
গৌরচন্দ্র রোহিনীচন্দ্র করিমু যে পান
কৃষ্ণসুতে সহিল উত্তর না দিয়া গেল
তবে পাইব প্রভুর উদ্দেশ

এত দুঃখ না সয় শরীরে
বালিসুতে জরজর কাঁদি আমি নিরন্তর
কোন মতে পাইমু প্রভু দবশনি
অষ্টসীতা বসাইল নানা যুক্তি দেখাইল
সে অঞ্চলে কন্যা সুবদনী
কন্যা বলে অষ্টসীতা অষ্টশির মোর পিতা
ন কহিও কভু আত্মি
কন্যা কথা না কহিও অঙ্গে-অনল জ্বলিও
তবে (মোর) পিতা হবে বধভাগী ॥

(পয়ার)

আঙু পারজ্যা আর সীতা চরণে শ্বশুর
বাড়াইয়া দিল কন্যা আর কত দূর।
হেন মতে না কহিও তত্ত্বকথা সার
অবশ্য হইবে জান লোকেতে প্রচার।

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে কির্বা পুরে মনোরথ
অষ্টসীতা দেখাই দিল সেই নিজপথ
সেই দিন গেল জান সেলচছরী থুমে[৬]
কতদিন রাখিল কন্যা তন্যাপারা লোকে।
'পাজাচখা' নদী ছিল নাক্‌ন বন্দিনী
তার ঘরে গুপ্তবেশে রৈল (কন্যা) সুবদনী।
কতদিনে তারি পিতায় করিল উদ্দেশ
উদ্দেশ না পাইয়া আইল আপনার দেশ ॥

আষাঢ় মাসেতে কির্বা মনে নাহি সুখ
কন্যা হইয়া পিতায় এত দিল দুখ।
পুনর্বারে সেই কন্যা আতুরায় পাইল
বিচিত্র তনয় যেন আচমকা ভুঞ্জিল।
আতুরায় বলে প্রিয়া এথায় কেনে আইলা
ব্যাঘ্র ভয়ে আর তুমি কেন না ডরাইলা।
কির্বায় বলে ভক্তি আছে মোর মনে
লাচারী প্রবন্ধে মুই দুঃখ বিবরণে ॥

(ত্রিপদী)

একেশ্বরী চলিলুম বহু দুঃখ পাইলুম
তারে কহিলুম বাণী
মোর দুঃখ ডাকিছিল নানা যুক্তি তবে দিল
তবে চলে সেই নিজ পথে।

জঙ্গল কানন ভ্রমিয়া ছাড়িয়া আইলুম নিজ পরি রহিয়া
সঙ্গে নাই কোন জন মোর
দিল প্রভু আলিঙ্গন সন্দে ছিল মোর মন
জুড়াই গেল অঙ্গ শরীর।
পূর্ব ফলে জন্ম হইলুম ধর্ম ফলে তোরে পাইলুম
তবে মোর পূর্ণ হইল মনে
তোমারে ছাড়িয়া আমি রাত্রি দিন কাঁদি আমি
নিদ্রাকালে দেখিলুম স্বপনে।
তুমি মোর নিজ বন্ধু তরাইবে ভব সিন্ধু
তবে তুমি হইও নিজপতি
আতুরায় বলে...
গুণনিধি বিধাতায় মিলাইল আনি
বাপে তোরে তুলি নিল বিধাতায় বিমুখিল
তোর লাগি অন্ন নাহি জানি
সীতা হারাইল রাম না পুরাল মনস্কাম
উদ্ধারিয়া নিজরানী লইল
সেই মতে তোরে পাইল কামানলে দহিছিল
রাত্রি দিনে করি রাজকেলি
সদায় আনন্দময়ে কৃষ্ণসুতে নিশি
কির্বায় বলে অষ্টসার না পুরাইলাম পুনর্বার
হারাইলে না পাইব ॥

(পয়ার)

এই মতে আতুরায় কির্বাবিরে পাইল
শিশু পাইয়া ইন্দ্র ঘন আনন্দ হইল।

শ্রাবণ মাসেতে কির্বা খালে নালে পানি
পূর্ব ফলে বিধাতায় মিলাল যে আনি।
দূর চাঁদ ধরা পাইল যেন সফল সরস্বতী
হেনমতে পাইল আতুরায় কির্বা গুণনিধি।
বিভীষণে পাইল লঙ্কা রাবনার শেষে
কন্যা লইয়া আতুরায় যাইব কোন দেশে।
মুনি বাপ বুদ্ধি পাক তনু করল্য ক্ষীণ
ঠাগুরজ্যার ঘরে আনি রাখে কত দিন।

এই ভাদ্র মাসে কির্বা রূপে গুণে ধন্যা
বগাছরী জুমে গিয়া রাখিলেক কন্যা।

পুরুষের বেশ ধরি চলে কন্যা খালি
হাঁটিতে না নড়ে পা খঞ্জনের মুখী
নিল দশ প্রিয়া লাগি আছে অঙ্গে
দুই জনে চলি গেল বুড়াবুড়ি সঙ্গে।
সুন্দর খঞ্জন কন্যা দুই চক্ষু লাল
পুত্রবন্ধু ঘরে রাখিতে খাইল জঞ্জাল।

আশ্বিন মাসেতে কির্বা পুষ্পরসে মেলা
আতুরায় পাইল যেন চিকনিয়া কালা।
যেবা গায় যেবা শুনে কির্বা বারমাস
পাপ ছাড়ি পুণ্য বাড়ে বৈকুণ্ঠে নিবাস ॥

[১. কির্বাবির পিতার নাম, ২. আবির, ৩. সমাজপতির নাম ৪. দিয়ে দে ৫. ক্লান্ত, ৬. সেলচ্ছরি নদীর উৎপত্তিস্থল]

চাকমা সমাজে মেয়াবির বারমাস খুবই জনপ্রিয়। বিরাজমোহন দেওয়ানের 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বারমাসটির কিয়দংশ সংকলিত হয়েছে। সংকলিত অংশটি নিম্নরূপ :

প্রথম বৈশাখ মাস দেবায় গল্য কালা
আমারে ছাড়ি মেয়া কারে দেখ ভালা।
তুমি ছাড়িলে মেয়া আমি না ছাড়িব
রাত্রিকালে নিদ্রা গেলে স্বপনে দেখিব।
জ্যৈষ্ঠ মাসেতে মেয়া গাছে পাকে আম
মনকয়ে গলায় কলসি বাঁধি জলে দিতাম ঝাম
ঝাম্প দিয়া তেজেদুং বন্ধুহীন জীবন
তোমা বিনে মেয়া অন্ধকার এই তিন ভুবন।
আষাঢ় মাসেতে মেয়া ঝর হইল ভাড়ি
এমন সুন্দর দিনে তুমি মোরে কেন গেলা ছাড়ি
কি ব্যাধিতে ধয্যে মোরে কি দিলে পুরায়
এখন শিমেই তুলার মত মন বাতাসে উড়ায়।
শ্রাবণ মাসেতে মেয়া ধানে হইল থুর
কি লাগি মোরে মেয়া করহ নিঠুর
জোয়ারে ভরিয়া গঙ্গা পড়ি গেল ভাটা
যৌবন ফুরাইয়া গেল তোমার নাই আর আশা।
ভাদ্র মাসেতে মেয়া ধানে ধল্য পাক
কোথায় গেলে পাব মেয়া তোর লাক।
মুই যদি মেয়া তোর লাগত পেদুং
বাহু ধরিয়া তোরে কোলে তুলি লদুং।
উরি যাদে ব্যঙ্গমা পক্ষী ব্যাধ হাতে পড়ে
ললাটে লিখন ফল খণ্ডাইতে না পারে।

আশ্বিন মাসেতে মেয়া বরিষা অয়ে শেষ
যে দিকে যেয়ে মেয়া, করিম উদ্দেশ।
কালা কালা ককিলা কালা কালা মাথার কেশ
খঞ্জনের বুক কালা ঘুরে নানান দেশ।
নানা দিকে করি আমি ভ্রমণ ভুবন
মেয়ার দরশনে পুরাইতুং মন
তুমি ছাড়ি গেলে মেয়া কান্দিতে থাকিব
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি উদ্দেশ করিব।
কার্তিক মাসেতে মেয়া ফিরে বার্গিপাল
তাহারে দেখিলে উঠে মনে মায়াজাল
কলা লাগেই দুবা দুবা পাগেই খেম মুই ছড়া
ভাঙ্গিলে পিরিতি মেয়া, না লব-আর জোড়া ॥
অগ্রহায়ণ মাসেতে মেয়া সারাল্যা চিলে
চিজিক চিজিক করে
এই মতে দারুণ জ্বালায় শিহরিয়া ধরে।
ধরফরিয়া উঠে পরান স্থির নাহি মন
মদন ঘটেল জ্বালা নহে নিবারণ ॥
পুষ মাসেতে মেয়া শীতে কাঁপে বুক
তুমিত ছাড়ি গেলা মেয়া আমার মনে দুক।
পথ্যা জোয়ার সময় ময়ুর ধ্বনি করে
শুনিলে তাহার শব্দ চোখের জল ঝরে।

মাঘ মাসেতে মেয়া বনে গুজুরে বাঘ
তুমি ছাড়ি গেলা মেয়া আর না পাইব লাক।
চিজি পদি ডাকে মোরে ভরমিয়া ভরমিয়া
শুনিলে তাহার শব্দ প্রাণ নেজায় হরিয়া।
ফাল্গুন মাসেতে মেয়া বসন্ত উপাল
তাহা দেখি উঠে জ্বলি বাড়ে মায়াজাল।
উগ্রসেন সুত রিপু বড় অয়ে নিঠুর
খেলা ছাড়ি তুমি মেয়া গেলা মধুপুর ॥
চৈত্রমাসেতে মেয়া প্রাণ উঠে জ্বলি
অনেকদিন প্রেম করল্লুম মোরে গেলা ছাড়ি
এমন বয়স কালে মেয়া চিতে দিয়া কালি
যৌবন জোয়ারে তুমি কেন দিলে ডালি।
সোনা দিব তোলা তোলা রূপা দিব মাপি
এমন সুন্দর মেয়া তুমি মোরে কেনে গেলা ছাড়ি।

এই বারমাসীতে প্রিয়ার বিরহ বর্ণিত হয়েছে। বারমাসীটি চাকমাসমাজে এখনও জনপ্রিয়।

সুহৃদ চাকমা 'চাকমা সাহিত্যের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে (আলবেরুনী হল বার্ষিকী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০) প্রবন্ধে মধ্যযুগের (১৬০০-১৯০০ খ্রি.) চাকমাসাহিত্যে সমাজ সম্পৃক্ত সাহিত্য হিসেবে সান্দবী (চান্দবী) বারমাসী, কালেশ্বরী বারমাসী ও মেয়াবী বারমাসীর এবং স্নেহপ্রেম মিশ্র সাহিত্য হিসেবে তান্যাবীর বারমাসী ও মা-বাব বারমাসী-র আলোচনা করেছেন।

চান্দবীর বারমাসটির রচয়িতা পণ্ডিত ধর্মধন চাকমা। এর রচনাকাল আনুমানিক উনিশ শতকের শেষ দশক। রাঙ্গামাটির উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট চান্দবীর বারমাস-এর বেশ কয়েকটি পুঁথি সংগ্রহ করেছে। একটির সংগ্রাহক সুদত্ত চাকমা। দুটি পুঁথি সংগ্রহ করেছেন লালকুমার চাকমা। এছাড়া মণিস্বপন দেওয়ান, দেবব্রত চাকমা, সুসময় চাকমা এবং মৃত্তিকা চাকমাও চান্দবীর বারমাস সংগ্রহ করেছেন। চান্দবীর বারমাসীটি চাকমা রাজা ভুবনমোহন রায়ের (১৮৯৭-১৯৩০) আমলের একটি ঘটনা নিয়ে রচিত। এই বারমাসী এবং চিত্ররেখার বারমাসী ছাড়া অন্য কোনো চাকমা বারমাসীর রচয়িতার নাম জানা যায় না। চান্দবীর বারমাসীটি 'প্রেমের দ্রাক্ষারসে চর্বিত তখনকার সামন্তপ্রভুদের সামাজিক শাসন ও অন্যায়ের এক মূল্যবান দলিল। রূপসী চান্দবীকে বাগে আনতে না পেরে নারী মাংসলোভী চাকমা রাজা কি কৌশলে ষড়যন্ত্র করে মামা সম্পর্কীয় নোয়ারাম চাকমার ঔরসে চান্দবীকে অবৈধ সন্তান জন্মাতে বাধ্য করলো এ তারই লজ্জাকর ইতিহাস। বারমাসীতে উল্লেখ আছে যে চান্দবীকে যখন তার জারজ সন্ত ান দরবাস্যাসহ সালিশের জন্য যেতে হয়, তখন রাজা ভুবনমোহন রায় নোংরা কূট ইচ্ছা পূরণের জন্য বরগাঙের (কাজলং নদীতে) পানিতে ছাগল মানস সম্পাদন করে। সন্তান জন্ম নেবার অপরাধে চান্দবীর সামাজিক সাজা হলো। যার ফলশ্রুতিতে সমগ্র বারমাসীর বর্ণনায় চান্দবীর আত্মগ্লানিরই রক্তক্ষরণ হয়েছে। মনে হয়, এ কারণেই এ বারমাসী চাকমা সমাজে অত্যধিক জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কাহিনীর বাস্তব সত্যতাও এর জনপ্রিয়তার দ্বিতীয় কারণ বলা চলে। ছড়ার দ্বন্দে ও পয়ার ছন্দে রচিত এ বারমাসী মধ্যযুগের বাংলা মঙ্গলকাব্যের প্রভাবপুষ্ট। চান্দবীর জন্মবৃত্তান্তের সাথে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত 'কালকেতু উপাখ্যানের ফুল্লরার জন্ম বৃত্তান্তের প্রায়ই সাদৃশ্য আছে। এর ভাষা কিছুটা বাংলা বর্জিত।' (সুহৃদ ২০০৫ : ১০৭-১০৮)

১৯০৩ সালে পুষ্পমণি চাকমা রচনা করেন চিত্ররেখা বারমাস। এই বারমাসীতে চিত্ররেখার প্রণয়ের ব্যর্থতার বিয়োগাত্মক কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। রাঙ্গামাটির উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট থেকে ২০০৩ সালে 'চান্দবী বারমাস ও চিত্ররেখা বারমাস' একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে।

কালেশ্বরী বারমাসীর নায়িকা কালেশ্বরী রূপে-গুণে অনন্যা। কিন্তু তার স্বামী জোটেনি। এর সামাজিক কারণ কবি বর্ণনা করেন নি। সুহৃদ চাকমা মনে করেন, 'সম্ভবত এটি অর্থনৈতিক-সামাজিক সমস্যার ফল। সে সময় সামন্ত তাবেদারদের

শাসন-শোষণ-অত্যাচার খুব চরমে পৌঁছেছিল। মনে হয়, সমাজের সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে জীবন ধারণের উপায়ও হারিয়েছিল। কালেশ্বরীর এ করুণ অবস্থা চাকমাদের তীব্র সামন্ত শ্রেণী বৈষম্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়; যা দেখে মনে হয় কবিও তার বিরুদ্ধে মনোভাব প্রকাশ বা প্রতিবাদ করার সাহস পাননি। আর দরিদ্র পিতার ঘরে সামন্ত মেয়ের কথা কল্পনা করাও কষ্টকর। বিশেষত চাকমা সমাজে তখন পণপ্রথা বিদ্যমান ছিল। তবে এটি গৌণ, কারণ কালেশ্বরীর পিতার অভাব-অভিযোগ প্রখর ছিল না। কবি কালেশ্বরীকে ধর্মকর্ম করার সৎ পরামর্শ দিলেও সে তা পালন করল না। জীবনকে উপভোগ করার স্বাভাবিক আশা, বাঁচার স্বাদ, সর্বোপরি চঞ্চল যৌবন সব ব্যর্থ করে দেয়। কাঁদায়। (সুহৃদ ২০০৫:১০৮)

স্নেহপ্রেমমিশ্র সাহিত্য হিসেবে সুহৃদ চাকমা তান্যাবীর বারমাসী ও মা-বাবর বারমাসীর আলোচনা করেছেন। তান্যাবীর বারমাসীতে কোনো মাসের উল্লেখ নেই। তাই এটা আসলে বারমাসী নয়-গান। কিংবদন্তিও বলা যেতে পারে।

মা-বাব বারমাসীতে একটি অনাথ বালকের দুঃখ কষ্টের কথা বর্ণিত হয়েছে। এই বারমাসীর দুটি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছেন আর্যমিত্র চাকমা। 'এতে চৈত্রমাস হতে বৈশাখ মাস পর্যন্ত তার স্নেহ ভালোবাসাবঞ্চিত ছোট জীবনের প্রতিদিনের দুঃখ দৈন্যের কথাই বারবার কেঁদে ফিরেছে। বালকের ছোট হৃদয়ের ছোট কথাগুলো এখানে বর্ণনার বৈদগ্ধ্যে বেদনার উচ্চগ্রামে পৌঁছেছে। বৈশাখের বাদলা দিন, আষাঢ়ের ঝড়ো হাওয়া বজ্রপাত, গ্রীষ্মের প্রখর রোদ, শীতের কনকনে ঠাণ্ডা ইত্যাদি প্রাকৃতিক অবস্থায় সে নিজের নিরাপত্তার অভাব বোধ করে। বাবা-মার নানা কথা, না-পাওয়া সুখ স্মৃতি স্নেহ তাকে বারবার হতাশাগ্রস্ত করে। সে সমস্ত সংসারের চারদিকে তার অসহায়ত্বের জবাব খোঁজে; শুধু জবাব চায়। কিন্তু তার এ জিজ্ঞাসা বাড়ে। পাহাড়ের গায়ে আঘাত লেগে ফিরে আসে আরও জিজ্ঞাসা নিয়ে। মানুষের সামান্য ভালোবাসার জন্য সে কাঙাল।

এর রচনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী, সাবলীল ও মার্জিত। বারমাসীর মধ্যে এটাই বাৎসল্য রসে করুণ, যার অশ্রুতে পাঠকের মনও সিক্ত হয়ে উঠে। বৈশাখ মাসের বর্ণনায় আছে—

বৈশাখ মাসেতে মা-বাব অইল নিধন
সেবিতে ন দিলে বিধি মা-বাব চরণ।
ফুটিল মালতী ফুল গন্ধ অল দূর
আমারে ছাড়িনে মা-বাব গেল স্বর্গপুর।
স্বর্গপুরে গিয়ে মা-বাব সব পাসরিল
দুধের কমল যাদু কারে গোঝেই দিল।
ছোটকালে মোর মা-বাব গেলরে ছাড়িয়া
মা-বাব লাগিয়া মুই মরিছে কান্দিয়া। ইত্যাদি'

(সুহৃদ ২০০৫:১০৯-১১০)

চাকমা লোকসাহিত্যে যতগুলো বারমাসীর নাম পাওয়া যায় তা সবগুলো সংগৃহীত হয়নি। রাঙ্গামাটির উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট সংগৃহীত অপ্রকাশিত অন্যান্য বারমাসীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চিন্দাপুদি বারমাস, রাধেকা বারমাস, সখী বারমাস, সীতা বারমাস, কাজলপতি বারমাস ও সুত্তপুদির বারমাস। প্রথম চারটির সংগ্রাহক লালকুমার চাকমা অপর দুটি বারমাসী সংগ্রহ করেছেন যথাক্রমে বিমলকান্তি চাকমা ও বীরকুমার চাকমা। যে সকল বারমাসী সংগৃহীত হয়নি সেগুলো হচ্ছে রঞ্জনমালার বারমাসী, সাননোয়বীর বারমাসী, রত্তনবীর বারমাসী, যুদ্ধপুদির বারমাসী, কালিন্দী রানীর বারমাসী, শেয্যোয়া কন্যার বারমাসী। সুহৃদ চাকমার মত আমিও বিশ্বাস করি 'এগুলো ছাড়াও অনাবিষ্কৃত কিছু বারমাসী চাকমা সমাজে এখনো থাকতে পারে।' (সুহৃদ ২০০৫ : ১১০)

চাকমা বারমাসীগুলোর উদ্ভব সম্পর্কে আর্যমিত্র চাকমা মনে করেন, 'মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রভাবে এবং অনুকরণে চাকমা বারমাসী গুলো উদ্ভব ও প্রসার লাভ করলেও চাকমা বারমাসীগুলোর স্বাতন্ত্র্য কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। বারমাসীগুলোতে জুম নির্ভর চাকমা সমাজের আর্থসামাজিক অবস্থা বিকাশের চিত্র পাওয়া যায়। জুম নির্ভর চাকমা সমাজে জীবন ঘনিষ্ট কোন আখ্যান বা ঘটনা নিয়ে উদ্ভব ঘটে এবং চাকমা কাব্যরস পিপাসুগণের মাধ্যমে তার প্রসার ঘটে। এই আখ্যান বা ঘটনাগুলোর জীবন ঘনিষ্টতা হেতু বরাবরই সাধারণ মানুষের মনে ঠাঁই নিতে সক্ষম হয়। সাধারণ মানুষ নিজের মনের সুখ-দুঃখের কথা খুঁজে পায় এ জীবন ঘনিষ্ট বারমাসীগুলোতে। লক্ষণীয়, চাকমা কাব্য রসপিপাসু বারমাস রচয়িতাগণ তাদের বারমাসীর উপজীব্য বাছাইয়ে বরাবরই কোন নারীর আখ্যান বা ঘটনাকে বেছে নিয়েছেন। সেই বিনোদন মাধ্যমহীন অভাবের যুগে জীবন ঘনিষ্ট এই আখ্যান বা কাব্যরস মিশ্রিত বারমাসগুলোর প্রতি কমবেশী সব বয়সের মানুষের আকর্ষণ ও কদর থাকা স্বাভাবিক। চাকমা বারমাসীগুলো পরবর্তীকালে খুঁজে পায় টিকে থাকার মত প্রাণস্পন্দন গতি নির্যাস। ধারণা করা হয় পূর্ব থেকেই মৌখিকভাবে নরনারীর সুখদুঃখের বর্ণনা সম্বলিত লোকসাহিত্য চাকমা জনগোষ্ঠীর কাছে জনপ্রিয় ছিল। এতে চাকমা উভাগীতের সুরের প্রাধান্য থাকত। এতে আরো ছিল জুম নির্ভর চাকমা সমাজের নির্জন পাহাড়ঘেরা ভৌগোলিক পরিবেশের হৃদয়ের গভীরের ভাষা প্রকাশের সুস্পষ্ট এক সহজ সরল উচ্চারণ। পরবর্তীকালে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও বারমাসীর প্রভাবে এ লোকসাহিত্য থেকে উভাগীতের প্রভাবটি ক্ষীণ হতে থাকে এবং তদস্থলে কোথাও কোথাও স্থান করে নেয় পয়ার, ত্রিপদী, পাঁচালী ছন্দ ও মাসওয়ারী বিবরণ সম্পন্ন সুখ-দুঃখের আখ্যান। এভাবে সম্ভবত গড়ে ওঠে চাকমা বারমাসীগুলোও।' (আর্যমিত্র ২০০৩ : ৭৬-৭৭)।

গীতিকা

গীতিকা, লোকগীতিকা, গাথা, লোকগাথা, পালা বা পালাগান প্রভৃতি নানা নামে প্রচলিত দীর্ঘ গীতি আখ্যান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যে আছে। গীতিকার সংজ্ঞা ও স্বরূপ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত হল :

১. গীতিকা সম্পর্কে প্রথম কথাই হইতেছে যে, একটি বিশিষ্ট কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইহা রচিত হইবে এই কাহিনী শিথিলবদ্ধ হইলে চলিবে না বরং দৃঢ়বদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। কাহিনী মাত্রেরই কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে; যেমন ক্রিয়া (action), চরিত্র, পরিবেশ ও বিষয়বস্তু। গীতিকার মধ্যেও ইহাদের প্রত্যেকেরই অস্তিত্ব থাকিলেও তাহাদের মধ্যে ক্রিয়া বা action-ই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে-অন্যান্য বিষয় গৌণ হইয়া যায়। ইহা কাহিনী প্রধান রচনা, চিত্র প্রধান রচনা নহে। কিন্তু বিশেষ একটি কাহিনী ধারা যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ইহার মধ্যদিয়া অগ্রসর হয়, তাহাও নহে। একটি আনুপূর্বিক কাহিনীর সঙ্কটময় কয়েকটি মুহূর্তের উপর জোর দিয়া ইহা বর্ণনা করা হয়-ইহাতে কাহিনীর বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির দোষ দূর হইয়া গিয়া ইহা নাটকীয় গৌরব লাভ করিতে পারে। (আশুতোষ ২০০৪:৩৩৩)

২. জটিলতামুক্ত একটি ঘটনাকেন্দ্রিক আখ্যান, সচরাচর যা জনপ্রিয়; নাটকীয়তার মধ্যদিয়ে কোনো প্রকার নীতি-উপদেশে ভারাক্রান্ত না হয়ে সারল্যকে রক্ষা করে, অপরিণত চরিত্রকে উপলক্ষ্য করে, ঘটনা ও সংলাপকে আশ্রয় করে গোষ্ঠী বিশেষের মানসিকতা সঞ্জাত হয়ে অজ্ঞাত পরিচয় রচয়িতার আত্মনির্লিপ্তির পরিচয়বাহী, মৌখিক ঐতিহ্যে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাকৃতির স্তবকে রচিত যে সঙ্গীত, তাই হল গীতিকা। (বরুণ ১৯৭৩:৩)

৩. মৌখিক ঐতিহ্যনির্ভর লোকসংস্কৃতির উত্তরাধিকারী সমাজের মানসিকতাকে অবলম্বন করে, সহজ সরল কাহিনী ছন্দসুরে, বর্ণনাধর্মী ও হালকা রোমান্সধর্মী চেতনায় জাত, শাখা কাহিনীনির্ভর উপন্যাসধর্মিতায়, অপরিণত চরিত্র উপজীব্য করে শিথিলভাবে বিন্যস্ত, অজ্ঞাতপরিচয় রচয়িতার নৈর্ব্যক্তিক চেতনায় ঋদ্ধ, উপভাষা কিংবা লোকভাষার সংলাপ নির্ভরতায়, কাব্য ও নৃত্যগীতময় বন্দনাসহ ধূয়াপদ সংবলিত রসে সিক্ত, অচিন্তিতপূর্ব অভিব্যক্তির বৈচিত্র্যময় সঙ্গীতই গীতিকা। (ফাত্তাহ ২০০৫:৩০)

আগেই বলা হয়েছে চাকমা লোকসাহিত্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। চাকমাভাষায় বেশ কয়েকটি গীতিকা প্রচলিত আছে। এগুলোকে চাকমাভাষায় পালাগান বলা হয়। 'চাকমা-সাহিত্য, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক চারণ কবি গেংউলীরা সেগুলো মুখে মুখে কথিত দৈব বলে গেয়ে থাকেন। চাকমা সমাজে এ চারণ কবি সম্প্রদায়ের উদ্ভব কোন সময়ে ও কোন স্থানে তারও সঠিক কোন ইতিহাস নেই। এটুকু সত্য যে তাদের ধ্যান ধারণার সাথে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ধর্মের কোথাও একটা যোগসূত্র আছে। উদাহরণ হিশেবে উল্লেখ করা যায় তারা পালা আরম্ভের সময় ভারতবর্ষের প্রাচীন দেবদেবীদের বন্দনা করেন। পালাগুলো অসংখ্য পর্বে বিভক্ত। এগুলো আবৃত্তি করে পাঠ হয় না, বেহালা-সারঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গীত হয়। প্রত্যেক পর্বে বর্ণনাদৃশ্য, আরম্ভের শুরুতে শ্রোতারা এ্যা-হু-হু ধ্বনি দেয়। এ ধ্বনিকে চাকমা ভাষায় রেঙ বলে, যা বাংলায় অনেকটা ধুয়া এর মতো। গেংউলীরা দৈববলের উপাচার হিসেবে চাল, কুলা, টাকা পান, সুপারি ও দু'বদনা ভর্তি পানি সাদাসুতা দ্বারা সংযুক্ত করে। অতঃপর তৈল প্রদীপ জ্বেলে তুলসী পাতায় সাজাতে হয়। তারা গান গাবার সময় শ্রোতাদের ভূত ভবিষ্যৎও বলে দেয়। বস্তুত, এ ব্যাপারগুলো চাকমাদের ইতিহাসও বলা চলে। ইতিহাসের সাথে আবার সংযুক্ত রয়েছে বীরত্ব, ঐতিহ্য, প্রেমের ট্রাজেডী, কমেডী আর সাহিত্যের রসবোধ।' (সুহৃদ ২০০৫:৯৪)

চাকমা লোকসাহিত্যে গীতিকা বা পালাগান এর সংখ্যা খুব কম নয়। সবগুলো পালা এখনও সংগ্রহ হয়েছে বলে মনে হয় না। সংগৃহীত গীতিকাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও জনপ্রিয় পালা হল 'রাধামন ধনপুদি'।

রাধামন ধনপুদি পালা সম্পর্কে জেলা গেজেটিয়ার্সে বলা হয়েছে The Chakmas have got many popular legends, Their main legend is about 'Radhaman' and 'Dhon Pati'. The legend speaks the story of their ancestors, their valour and ideals and is sung during the festivals and ceremonial occasion.' (Ishaq 1975 : 211)

Chittagong Hill Tracts District Gazetter (Calcutta 1909) গ্রন্থে R.H.S. Hutchinson রাধামন ধনপুদির কাহিনীর ফুলপারা অংশটি ইংরেজি গদ্যে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তী গেজেটিয়ার্সগুলোতেও এটি উদ্ধৃত হয়েছে।

'চাকমা জাতি' (১৯০৯) গ্রন্থে সতীশচন্দ্র ঘোষ এবং 'আরণ্য জনপদে' (১৯৬৬) গ্রন্থে আবদুস সাত্তার রাধামন ধনপদি কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংগ্রাহক গীতিকাটি (সম্পূর্ণ বা আংশিক) সংগ্রহ করেন। অনেকে পালাটি বাংলা হরফে বর্ণান্তরিতও করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কার্ত্তিক চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা, নোয়ারাম চাকমা, মুকুন্দলাল চাকমা, নবীনচন্দ্র চাকমা, বিরাজমোহন দেওয়ান প্রমুখ। ১৯৮০ সালে সুগত চাকমা ও সুসময় চাকমা

সম্পাদিত রাধামন ধনপুদি ১ম খণ্ড (জুমকাবা খণ্ড) এবং ১৯৮২ সালে চিরজ্যোতি চাকমা সম্পাদিত ২য় খণ্ড (ফুলপারা খণ্ড) প্রকাশিত হয়। গীতিকাটির প্রধান প্রধান পর্বগুলোর সংকলন 'রাধামন ধনপুদি' ২০০৪ সালে রাঙ্গামাটির উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থের সম্পাদক সুগত চাকমা; সহযোগী সম্পাদক চিরজ্যোতি চাকমা ও সুসময় চাকমা। গ্রন্থের শুভেচ্ছা বাণীতে ড. মানিকলাল দেওয়ান যথার্থই লিখেছেন, 'যুগ যুগ ধরে চাকমা চারণ কবি গেংখুলিগণ দেশ থেকে দেশান্তরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই জনপ্রিয় লোকগীতিটি গেয়ে শতসহস্র রজনীতে অজস্র শ্রোতাজনকে আনন্দ দান করেছে এবং আজও পাহাড়ের অন্দরে কন্দরে, গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আনন্দ দান করে চলেছে। এতে চাকমা কিংবদন্তীর সেরা বীর রাধামনের শৌর্য, বীর্য এবং তার অনিন্দ্য সুন্দরী প্রেমিকা ধনপুদির প্রেমের অপূর্ব কাহিনী রয়েছে যা শুনে শ্রোতা সাধারণ আনন্দিত, উল্লসিত এবং মুগ্ধ হয়ে উল্লাসধ্বনি রেইং দিয়ে তাদের আনন্দ প্রকাশ করে। জনশ্রুতি মতে, এই ব্যালাডটি সাতদিন সাত রাত ধরে এক নাগাড়ে গেয়েও গেংগুলিগণ এর সম্পূর্ণ কাহিনীগুলির বর্ণনা শেষ করতে পারে না।'

রাধামন ধনপুদি গীতিকাটি বহু খণ্ডে বিভক্ত। প্রধান খণ্ডগুলোর শিরোনাম জুমকাবা, রান্যাবেড়া, বার্গীধরা, ঘিলাপারা, ঘিলাখারা, রানী কুহুয়া, বিঝুদিন' কধাগ, লুইছাগা, ফুলপারা, রাধামন ধনপুদি মেলা এবং সাপ্রেকুল। 'এ পালার নায়ক চম্পা রাজকুমার বিজয়গিরির নির্বাচিত বীর সেনাপতি রাধামন। উৎস, চাকমা রাজ্য চম্পকনগরের প্রেমঘন আরণ্যক পরিবেশ ও সেখান হতে রাধামনের সেনাপতি হয়ে চাদিগা (চট্টগ্রাম) যুদ্ধযাত্রা রাজা বিজয়গিরির সময়ের ঘটনা। চাকমারা এই নায়ককে তাদের জাতীয় বীরের প্রতীক হিসেবে শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে জীবন্ত করে রেখেছে। আর নায়িকা ধনপুদি, যাকে চাকমারা আদর্শ রোমান্টিক প্রেমিকা হিসেবে যুগে যুগে স্মরণ করে আসছে। চাকমাদের তথা রাধামনের স্বদেশ প্রেম, সামাজিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের ইত্যাদি প্রসঙ্গের ভেতর ধনপুদি ও রাধামনের দ্বন্দ্ব মধুর প্রেমই এ ব্যালডে প্রধান করুণ সুরে ঝঙ্কৃত হয়েছে। (সুহৃদ ২০০৫ : ৯৫-৯৬)

রাধামন ধনপুদি পালার 'ফুলপারা' খণ্ডের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল :

জাদি পুজাত চোর্জ্যেগি
পোহুত্যা রাঝি পোর্জ্যেগি
দারু বাদি সর্ঝ্য তেল
ঝগমগে উদেত্তে রাঙাবেল
বেলাত বাজে তাত্তানি
খেইদেই ললাক ভাতপানি ॥
ছুরি তাগল্লোই তোন কুদি
নোনেয়া ভোন্নুয়া ধনপুদি

আলু কুরি কামাত্তুন
পুঝার গর্ল্য মামাহ্‌ত্তুন।
আলু কুরি বর কামা
ফুলপারা যেদুংনে মর মামাহ ॥
ছ-মাচ বারিঝা পানবরত
ছারি লইয়ং কামকরচ
পানত বাঝেই সিবিদি
বিদায় দিল কপুদি
কুজিরান্যা এহ্‌ল সে বন
যিধু যেবে যা-তর যে মন।
ভরা বন্দুক তাগেরলই
দা রাধামনরে দাগেরলই
পাদা কাবি তিন তারা
যেই না দাধু ফুলপারা।
গাবদ্যা মাদল বেবংনা
যেলেও বিধু যেবং না
কলা লাগেই আজারত
ধার তাগলান ধরিনে
লামিল রাধামন উধনত।
ধার তাগলান ধরিনে
লামিল রাধামত উধনত।
কাপ্যা থেঙা কর দিলাক
ফুগংতলী দ্যমুরা মুক্যা
দাদা বেবে লর দিলাক
ধ্যোজ্যা তারুমত নাকশাফুল
যেবাক দ্বিজন দোজ্যাকূল ॥
জাদি পূজাত চোজ্যন্দে
পিন্যাং ছরাত পোজ্যন্দে
গাচ্ছুয়া কাবি রুগানি
সিত্তুন বাদন ফুগংতলী
দ্যমুরার উজনী ॥
বিন্যা চত্তন খোইয়া কুরা
উদা ধোজ্যন দ্যমুরা
এক কাপ উধি তিনকাপ যান
দ্বিকাপ উধি তিনকাপ যান
তিনকাপ উধি চেইর কাবত
চেইর কাব ফুরেই পাচ কাবত

জাদি পূজাত চোজ্যন্দে
পাচ কাব মাধাত পোজ্যন্দে
চগদায় কামাল্যা ঘেরে আন
ঝরঝরে পরের হেইয়া ঘাম ॥
মোনত উধি ব খাদন
গাছত তলে জিরাদন ॥
দুরন্দি আদামান রিনিচান
খল্যামিলি পানখান
ছরাত দিলুং চেইগধা
স্বর্গপুরী সানগরি
দুরত দেখা যায় ধনপাদা ॥

সতীশচন্দ্র ঘোষ সংক্ষেপে রাধামন ধনপুদির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণিত কাহিনী সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

সাধিংগিরি রাজার একমাত্র কন্যা, নাম ককপতি। ককপতি স্বয়ংবরা হয়ে জয়মঙ্গলকে বিয়ে করে। তাদের সংসার বড়ই সুখে চলছিল। কিছুকাল পরে ককপতি এক কন্যা সন্তানের জননী হন। তার নাম ধনপুদি।

চম্পকনগরের অন্য এক রাজা হরিশ্চন্দ্র, রানী মেনকা। তাদের পুত্র রাধামন। বাল্যকাল থেকেই ককপতি ও মেনকার মধ্যে সখ্য ছিল। একবার মেনকা রাধামনকে ককপতির কাছে রেখে অন্য স্থানে কোনো কাজে যায়। রাজা সাধিংগিরি তখন রাধামন ও ধনপদিকে এক দোলনায় রেখে দোলাতে দোলাতে গাইলেন—

সোনা দোলনৎ রূপার দড়ি
দাদালৈ বেবেই ঘুম যাদন সমারে পড়ি ॥

ক্রমে রাধামন ও ধনপুদি যৌবনে পদার্পণ করে। উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা জন্ম নেয়। তারপর এক রাতে তারা পালিয়ে যায়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর নদীতীরে তারা ধরা পড়ে। শেষ পর্যন্ত তাদের প্রণয় পরিণয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

চম্পক নগরের প্রধানরাজা উদয়গিরি। সাধিংগিরি ও হরিশ্চন্দ্র তাঁর অধীন সামন্তরাজা। উদয়গিরির দু'ছেলে বিজয়গিরি ও সমরগিরি। বিজয়গিরি দিগ্বিজয়ে যাবেন। তিনি রাধামনকে সৈনাপত্যে বরণ করলেন। ধনপুদি রাতে ভীমরাজ পাখির কান্না শুনে। এটা অমঙ্গলসূচক। তাই সে রাধামনকে রাজসমীপে যেতে বারণ করে; কিন্তু রাজাদেশ অমান্য করা সম্ভব নয়। রাধামন বিজয়গিরি সমীপে গেলেন। রাজা শপথ করলেন যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরলে বিজিত রাজ্যের অর্ধেক রাধমনকে দেবেন। রাধামন যুদ্ধে যাবার আগে পত্নীর সঙ্গে দেখা করলেন। চৈত্র মাসের ১৫ তারিখ তিনি যুদ্ধ যাত্রা করেন। এদিকে পতিবিরহবিধুরা ধনপুদি বিলাপ করত লাগলেন—

লইয়ে পরানে বিড়বিড়
খেলুং মাথা তরাজা বিজয়গিরি।

চাকমাসমাজে প্রচলিত পালাগান 'চাদিগাং ছারা পালা'-কে সুহৃদ চাকমা 'ইতিহাসসম্পৃক্ত সাহিত্য' আখ্যা দিয়েছেন। এই গীতিকাটি রাধামন পালার দ্বিতীয় খণ্ড। চাদিগাং ছারা পালার কাহিনী সতীশচন্দ্র ঘোষের অনুসরণে বর্ণিত হল :

যখন যুবরাজ বিজয়গিরি দক্ষিণাভিমুখে দিগ্বিজয় গমনে সংকল্প করছিলেন তখন আরাকান রাজা নানা কুস্বপ্ন দেখছিলেন। কেবল স্বপ্ন নয়, দিনে শিয়ালের ডাকসহ নানা অমঙ্গলসূচক ঘটনা দেখতে লাগলেন। দৈবজ্ঞ গণনা করে জানালো যে উত্তর দিকে শত্রু জন্মগ্রহণ করেছে।

যুবরাজ বিজয়গিরি সেনাপতি রাধামনকে পাঠিয়ে নিজেও পরে এসে যুদ্ধ শিবিরে যোগদান করেন। রাধামনের সৈন্যরা যুদ্ধে যেতে যেতে বলেছে—

গেলুং ছরার উজানি
মঘদেশ কুদু আগে কি জানি?
(ছড়ার উজান দিকে যাচ্ছি, মঘদেশ কোথায় কে জানে?)

কৈগাং নদীতীরে পৌঁছার পর মঘরাজ সমীপে দূত পাঠানো হল। মঘরাজা যুদ্ধ করতে এগিয়ে আসলেন। যুদ্ধে মঘরাজা পরাজিত হন। তিনি রাজ্য হস্তান্তর করে প্রাণভিক্ষা চাইলেন। এরপর রাধামন সসৈন্যে রোয়াংকুল থেকে পাঁচদিনে জালিপাগর্যা নামক স্থানে গেলেন। সেই রাজ্যও জয় করা হল। এরপর তারা উচ্চ ব্রহ্মদেশে গেলেন। ক্রমে রাধামন মঘদেশ, খ্যয়ংদেশ এবং অক্সাদেশ-তিন রাজ্য জয় করে কাঞ্চনপুর আক্রমণ করেন। বিনাযুদ্ধে এ রাজ্য জয় করা হল। এরপর কুকিরাজের সঙ্গে রাধামনের যুদ্ধ হয়। পনের দিন যুদ্ধ করার পর রাধামন বিজয়ী হন। বার বছর যুদ্ধ করার পর রাধামন বিজয়গিরি থেকে বিদায় নিয়ে দেশে ফিরে আসেন। তিনি যুদ্ধে যাবার সময় ধনপুদি অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। তার ছেলে হয়েছে নাম সারাধন। এদিকে বিজয়গিরি দিগ্বিজয়ে যাবার পর তার পিতা উদয়গিরি মৃত্যুবরণ করেছেন। সমরগিরি সিংহাসনে বসেছেন। বিজিত রাজ্যের শৃঙ্খলাবিধান করে দেশে ফেরার পথে কালাবাঘা প্রদেশে এসে বিজয়গিরি পিতার মৃত্যু সংবাদ অবগত হলেন। অনুজ রাজা হয়েছেন। তাকে কীভাবে সম্মান জানাবেন। তিনি বললেন—

পর্বোয়া পণ্ডিত নেই যে দেজৎ
যেদং নয় সৈন্যগণ সেই দেজৎ।

বিজয়গিরি সাইপ্রেয় কূলে ফিরে গেলেন। বিজিত দেশেই তিনি থেকে গেলেন। বিজিত দেশে বিয়ে করার জন্য সৈন্যদের অনুমতি দিলেন, নিজেও এক উচ্চ বংশে বিয়ে করে সেখানকার ধর্ম ও আচার অনুসরণ করতে লাগলেন।

এই দুটি গীতিকায় 'চাকমাদের পূর্বপুরুষদের শৌর্যবীর্যের কাহিনীই কীর্তিত হয়েছে। এ কারণে চাকমারা এই কাহিনী দুটিকে তাদের ধর্মের অঙ্গ হিসেবে স্থান দিয়ে থাকে। ...কাহিনীতে কতকগুলো প্রাচীন সংস্কারও চাকমাদের সামাজিক জীবনকে বদ্ধমূল দেখা যায়। ...ভীমরাজ পাখি স্বপ্নে দেখা চাকমাসমাজে অমঙ্গল বলে সূচিত হয়। চাকমাসমাজে কাহিনী দুটির গুরুত্ব অত্যধিক। কালের বিবর্তনেও এসবের জনপ্রিয়তা আজ পর্যন্ত একটুও কমেনি। (সাত্তার ১৯৭৫ : ৮৪-৮৫)

চাকমাসমাজে রাধামন ধনপদি এবং চাদিগাং ছারা পালা এখনও জনপ্রিয়। এই 'দুটো পালায় রাধামন ধনপুদির বিরহ মিলনাশ্রয়ী প্রেম কাহিনীর আড়ালে সমাজ ইতিহাস ঐতিহ্য যৌবন ও জৈবতার সুর স্পন্দিত হয়েছে; যাতে প্রসঙ্গগুলো Classic Romantic স্পর্শে সজীব হয়ে উঠেছে। চাকমাদের এ দুটো পালা ইংরেজি সাহিত্যের lyric এর সাথে তুলনা করা চলে; যার এক অংশ প্রেমমূলক lyric আর অপর অংশ স্বদেশ প্রীতিমূলক lyric। এখানে সুরাত্মক ও সহজে উচ্চারণ করা যায় এমন শব্দই বেশি, গানে ছড়ার ছন্দেরই প্রাধান্য বেশি, যদিও মধ্যে মধ্যে পয়ারের সুর শোনা যায়। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো বিশিষ্ট ছন্দের পুনরাবৃত্তির সাহায্যে গান রচয়িতা চারণ কবিরা গানের মূল ভাবটিকে গভীরতর করে তুলেছেন। তাই ঐ সব গানে সুরের প্রাধান্য এবং কথা ও সুরের সমন্বয় লক্ষণীয়। (সুহৃদ ২০০৫ : ৯৮-৯৯)

সৃষ্টি সম্পৃক্ত সাহিত্য হিসেবে সুহৃদ চাকমা লক্ষ্মীপালার বর্ণনা দিয়েছেন। এই পালাটিকে পৌরাণিক আখ্যানও বলা হয়। 'পৃথিবী ও মানব সৃষ্টি সম্পর্কে চাকমাদের প্রচলিত ধ্যান ধারণাই এই পালাগুলোর বিষয়বস্তু। নিরাকার গোঝেন (মতান্তরে নিরঞ্জন) জলের উপর স্থল সৃষ্টি করে তাতে মানব ও অন্যান্য জীব সৃষ্টি করলেন। তখন

দিল গোঝেনে মুয়াত মাত। মানেয়্যে কলাক ও গোঝেন ভাত ॥

অর্থাৎ গোঝেন যখন মানবের মুখে ভাষা দিলেন, তখন মানবেরা বললো, ভাত। গোঝেন তাদের এ কথা শুনে উদ্ভিদ জগতের গাছ, বাঁশ, ফুল, ফল ইত্যাদিকে সাহায্য করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু দেখা গেলো তারা মানবদেরকে মাত্র কয়েক বছর বাঁচাতে পারলো। তারপর পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। গোঝেন দেবদেবীদের নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন, সভায় মাত্র কুবরাজ দেবতাই মানবদেরকে বার বছর পালাবার প্রতিশ্রুতি দিতে পারলেন। প্রভু গোঝেন এতে সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাই একটা সুষ্ঠু সমাধানের জন্য স্বর্গহতে লক্ষ্মীদেবীকে আনবার প্রয়োজন পড়লো। কারণ লক্ষ্মী ফসল ও সম্পদের দেবী। গোঝেনের আদেশেই কালাইয়া মর্ত্য হতে স্বর্গে গেলেন। কিন্তু সেখানে তিনি অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে ব্যর্থ হলেন। তারপর আবার দুর্ভিক্ষ, আবার দেবীদের নিয়ে গোজেনের মন্ত্রণাসভা।

গোঝেন এবার বরকমল, ফুলকমল, নীলকমল ও দেবকমল নামে চার দেবতাকে স্বর্গে পাঠালেন। কিন্তু তারা কেউ সাত সমুদ্র পার হতে পারলেন না; ভয়ে সবাই ফিরে আসলেন। লক্ষ্মী আনা হলো না। তারপর লক্ষ্মী আনবার দায়িত্ব পড়ল গঙ্গাপুত্র বিয়েত্রার উপর। তিনি দুটি শর্তে লক্ষ্মী আনতে রাজী হলেন। ১. তিনি যদি লক্ষ্মীকে আনতে পারেন তাহলে মর্ত্য মানবদেরকে তার মা গঙ্গাদেবীকে পূজা করতে হবে; ২. তিনি যদি লক্ষ্মী আনতে পারেন তাহলে মর্ত্য মানবদেরকে তার মা গঙ্গাদেবীকে পূজার পরপরই তাকে পূজতে হবে। তার এই দুটি শর্তে মানবেরা রাজী হলো। বিয়েত্রা স্বর্গে গিয়ে তাঁর আচার ব্যবহারে লক্ষ্মীকে মুগ্ধ করলেন। লক্ষ্মী মর্ত্য মানবদের রক্ষা করতে রাজী হলেন। বিয়েত্রা লক্ষ্মীকে শুয়রের পিঠে চড়িয়ে মর্ত্য পথে পাহাড় পর্বত পার করালেন; মালপথ পার করালেন কাঁকড়ার পিঠে করে। কিন্তু সমুদ্র পার করাতে পারছেন না উত্তাল তরঙ্গের কারণে। তিনি তাঁর মা গঙ্গাদেবীর সাহায্যে সমুদ্রকে শান্ত করিয়ে কচ্ছপের পিঠে চড়িয়ে লক্ষ্মীকে পার করালেন। তারপর মাকড়সা অবতার কর্তৃক আঁশ দিয়া তৈরী স্বর্গমর্ত্য সেতু দিয়ে বিয়েত্রা লক্ষ্মীসহ মর্ত্যে পৌছালেন। সেদিন ছিলো বুধবার। লক্ষ্মীর মর্ত্যে আগমনে মানবরা হেসে উঠলো; পৃথিবী হেসে উঠলো; চারদিকে আনন্দের বান ডাকলো। পেঁচা লক্ষ্মীকে পিঠে করে সারা পৃথিবী ঘুরে দেখালো। বিষ্যুদবার পাখিরা পূজা করলো লক্ষ্মীর। লক্ষ্মী গাছপালাদের নিজের স্তন থেকে দুধদান করলেন। তাঁরই আশীর্বাদে পৃথিবী ঋতুবতী হলো, বৃক্ষেরা হলো ফলবতী...। লক্ষ্মীর উৎস যদিও ভারতবর্ষীয় পুরাণ, কিন্তু কাহিনীর পরিবেশনে এ পালা মৌলিকতার দাবি রাখে। এর ছন্দ গঠন ছড়ার, ভাষা প্রাচীন যুগের বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। (সুহৃদ ২০০৫ : ৯৯-১০১)

চাকমা লোকসাহিত্যে আরেকটি উল্লেখযোগ্য গীতিকা হল 'নরপুদিপালা'। বিশিষ্ট লোকসাহিত্য সংগ্রাহক বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান পালাটি সংগ্রহ করে বঙ্গানুবাদ সহ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রকাশিত 'গিরিনির্ঝর' পঞ্চম সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭) প্রকাশ করেন। পালাগানটি তিনি সুখ্যাত গেংখুলি নোয়ারাম চাকমা থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

কাহিনীর নায়ক নরধন আর নায়িকা নরপুদি। 'ঘিলাখেলা থেকে কৈশোরের খেলাঘর পেরিয়ে ওরা যৌবনে প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়েছেন। কী দেহের গড়নে, কী রূপে লাবণ্যে দুজনে ওরা সমান সমান।...বিকেল বেলায় যখন ঝিঁ ঝিঁ ডাকে, ওরা ভাবে কিন্তু কোন কূল কিনারা দেখতে পায় না। বিষয় চিন্তা ভাবনায় পড়ে, দুজনে ওরা ঘাটে গিয়ে পানিতে কিছু ভাত ছড়িয়ে পরস্পর সত্যবদ্ধ হলো চিরসাথী হবে ওরা জীবনে মরণে।' (বঙ্কিমকৃষ্ণ ১৯৮৭ : ১১৫-১১৬)

শীতকাল শেষ হলে জুমের জন্য জঙ্গল কাটতে অন্যদের সঙ্গে নরধনও রওয়ানা হল। সেখানে তারা জঙ্গল কাটতে শুরু করে। এদিকে অন্য পাড়া থেকে

নরপুদির বিয়ের প্রস্তাব আসে। নরপুদি জুমে নরধনের কাছে খবর পাঠাল। খবর পেয়েই নরধন ফিরে এসে নরপুদির কাছে সব শুনল। নরপুদির পরামর্শে নরধন ব্যবসার উদ্দেশ্যে দূর বন থেকে বাঁশ গাছ কেটে আনতে সম্মত হল। মহাজন থেকে সুদে টাকা এনে নরধন নরপুদির জন্য আতর, আংটি ইত্যাদি কিনে আনল। পরে সে সঙ্গীসহ বাঁশ ও গাছ সংগ্রহে বনে গেল।

এদিকে নরপুদির বিয়ের তারিখ ধার্য হল। সে তখনও নরধনের জন্য কাতর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে হার মানতে হল। বিয়ের পর সে স্বামীগৃহে চলে গেল। নরধন বাঁশ গাছ বিক্রি করে গয়না, কাপড় ইত্যাদি কিনে বাড়ি ফিরে। খবর শুনে সে মূর্চ্ছিত হল। মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে সে সব সওদাপাতি ফেলে জলটংগিতে গিয়ে বাঁশি বাজতে লাগল। নরপুদি তার স্বামীসহ পিত্রালয়ে এসে নরধনের বাঁশি শুনতে পায়। সে নরধনের সঙ্গে দেখা করে। সত্যভঙ্গের জন্য নরধন নরপুদিকে দায়ী করল এবং বলল যে, স্ত্রী জাতি সত্যপরায়ণা নয়। সে নরপুদিকে অভিশাপ দিল পরজন্মে সে শুশুক মাছ হয়ে জন্ম নেবে। নরপুদি নরধনকে অভিশাপ দিল সে পরজন্মে শঙ্খচিল হবে। সঙ্গীহীন হয়ে সে একাকী ডেকে ডেকে ঘুরবে আর নরপুদি যে ডাকে সাড়া দিয়ে পানির উপর ভেসে উঠবে। পালাটির শেষাংশ নিম্নরূপ—

মিঝা তুই মরেহ দিলে শাপ
কিঙিরি গনিবে ওদা তুই শুনি থাক।
কুলত মারি পান্যাসাপ
মিলায় যেবাক রান্যাচাপ
মেইয়্যা পরা যে পেবাক
রান্যাত ত্যন্ তগা যে যেবাক ॥
সারাল্যা ডাক যখন শুনিবাক
মাধা কাল্লোং বোজেবাক্
পুরানী ধুক্ক তুলিবাক
গুঝি গুঝি কানিবাক।
পুরি কলজ্যা আঙারা
যুগে যুগে থোক লাঙপুরা।
রঝের পিরিতি ভঙ্গ ওহল
খেলংগে জুমান রান্যা ওহল
যখন উধিল পহরফাদি
কানি কানি ঘরত গেল নরপুদি।
সাগর তরংগত কানের মন
উধিল ভাঙানত নরধন।

'মিছিমিছি তুমি আমাকে অভিশাপ দিয়েছ। এখন কি করে তুমি তোমার দিন গুনবে শুনে থাক। রান্যা জুমে মেয়েরা যাবে শাকপাত কুড়াতে। আমার মত যারা

দুঃখের অনলে পুড়েছে তারা তোমার (শঙ্খচিলের) ডাক শুনে তাদের মাথার টুকরি নামিয়ে রাখবে আর পুরানো দিনের সুখের কাহিনী মনে করে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে থাকবে। দুঃখের দহনে পুড়ে পুড়ে আমার কলজেটা যেমন অংগার হয়ে গেছে, প্রেমের খেলায় না পাওয়ার তীব্র দহন জ্বালা যুগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাক এই পৃথিবীতে। আমাদের রসের পিরিতি এখানে ভেঙ্গে গেল, সাঙ্গ হল প্রেমের খেলা, পরিত্যক্ত রান্যা জুমে যেমন সাঙ্গ হয়ে যায় বর্ষ ব্যাপী জীবিকা সন্ধান। ক্রমে পুবাকাশ ভোর হয়ে এলো। নরপুদি তখন কেঁদে কেঁদে ফিরে গেল নিজ ঘরে। নরধনের মন কাঁদে হা হা করে বিক্ষুব্ধ সাগরের মত উত্তাল হয়ে সে যেন সংসার সমুদ্রে একখানা ভাঙা তরীতে সঙ্গীহীন একা যাত্রী।' (বঙ্কিমকৃষ্ণ ১৯৮৭ : ১৩৪-১৩৫)

নোয়ারাম চাকমা থেকে বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান আরেকটি পালাগান সংগ্রহ করেছিলেন। এর নাম 'লাংঙ্যা লাঙোনী' পালা। এটি আকারে সংক্ষিপ্ত। কাহিনীটি আদিরসাত্মক। কাহিনীর শেষাংশে চাকমা জাতীয় বিচার পদ্ধতির পরিচয় আছে। বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান মনে করেন এতে পালাগানটির গুরুত্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে (বঙ্কিমকৃষ্ণ ১৯৮৯ : ৭০)। পালাগানটি বাংলা অনুবাদ সহ 'গিরিনির্ঝর' সপ্তম সংখ্যায় (জুন ১৯৮৯) প্রকাশিত হয়। পালাটির কাহিনী হল :

চম্পক নগরের খ্যংতুলি গ্রাম। তখন মানুষের অভাব অনটন ছিল না। ধানের শিসে যখন রঙ ধরত তখন যুবক যুবতীদের মধ্যে মন দেয়ানেয়া চলত। নায়িকা ঢেঁকিশালায় ধান ভানছে। ধান ঝাড়ার সময় একটা মশা তার বুকে কামড় দেয়। মশা মারতে গিয়ে কিসে লেগে তার হাত কেটে যায়। নায়ক তখন ঢেঁকিশালে এসে আসামলতার কচি ডগা পিষে মন্ত্র পড়ে জখমস্থানে লাগিয়ে দিল। পরদিন সকালে নদীর ঘাটে তারা আবার দেখা করবে স্থির হয়। নায়িকা সকালবেলা দেশলাই, সিগারেট ও পানের খিলি নিয়ে নদীর ঘাটে যায়। পরানবি পরানদাকে কড়া সিগারেট ও পানের খিলি খাইয়ে দিল। পরানবি বলল, 'আমার এ নব যৌবন শুধু তোমার জন্য।' জবাবে পরানদা বলল, 'তোমাকে নিয়ে সংসার করব, নয়তো আত্মহত্যা করব।' নদীর ঘাট থেকে দেরি করে আসায় পরানবির মা তাকে খুব বকল।

রাতে পরানদা ধানের গোলায় বসে বাঁশি বাজায়। পরানবির রান্না এলোমেলো হয়। কাজ সেরে গভীর রাতে সে পরানদার সাথে অভিসারে মিলিত হয়। এভাবে ক্রমে পরানবির দেহে ব্যাধের নিক্ষিপ্ত শরের চিহ্ন ফুটে উঠে। ব্যাপারটা পাড়ার লোকে জানার পর রাজদরবারে নালিশ হয়। রাজা পরোয়ানা জারি করেন। ওরা রাজদরবারে গিয়ে সত্য কথাই বলল। অবৈধ মিলনের দায়ে পরানদা পাড়াপড়শির ভোজের জন্য শূকর দণ্ড দিল। পরানবিরও অনুরূপ দণ্ড হল। এ ছাড়া নায়কের পনেরো টাকা ও নায়িকার দশ টাকা 'খুয়া ভাঙোনি' (ছিনালা মোকদ্দমার দণ্ড) দিতে

হল। এখন উভয়ের মা-বাবা রাজি থাকলে চুমুলাঙ (সামাজিক সংস্কার বিধান) করে সামাজিকভাবে বিয়ে হবে। কাহিনীর শেষাংশে চাকমাদের জাতীয় বিচার রীতির কথা বলা হয়েছে।

জাতীয় বিজার অহয় দি ধগে
খেল্যা কুদুম আর গরবা আঘে
গরবা কুদুম যানি ঔই যেব
সালেহ জুদা শাস্তিতে পেব।
পুরা শাস্তি অহঙ পঞ্জাজে
অহঙ আর কি আর মোঝে
তিল ফালায় চুল কাব্বি
কুরাহ বাহ ইক্ক তদাত তাঙেব।
আহদত লাভ তে কেন তারা
ঘবে ঘরে ফিরেব ধেন্দেরা।
পোত্তি উধানত যেই ঙে
কি অহ্ইয়ে তার কোই পেঙ।
গদা আদমান কবগোই
গাধি বুরপারি এবগোই
পানি ধালিব বত্ গাজত্
তেহ মিঝেই পারিব সমাজত।

অর্থাৎ জাতীয় বিচার দুভাবে হয়। বিবাহযোগ্য সম্পন্ন বা খেল্যাকুটুম হলে এরকম আর বিবাহ নিষিদ্ধ সম্বন্ধ বা গরবা কুটুম হলে অন্যরকম। তখন প্রত্যেকের সর্বোচ্চ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা হবে। ওদের মাথায় চুল তিন ফালি করে কাটা হবে, গলায় মুরগির খাঁচা ঝুলিয়ে হাতে বাঁশের কঞ্চি নিয়ে বাড়িবাড়ি গিয়ে ঢেঁড়া পিটাতে হবে। প্রত্যেক বাড়ির উঠানে গিয়ে দাঁড়িয়ে কী জন্য তার শাস্তি হচ্ছে তা বলতে হবে। পাড়া প্রদক্ষিণ শেষে নদীতে অবগাহন করে বটগাছের গোড়ায় পানি ঢেলে পরিশুদ্ধ হয়ে সমাজে মেশার অধিকার পাবে।

এই গীতিকাতে সেকালের চাকমা জাতীয় বিচার ব্যবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথম দিকে চাকমাদের সামাজিক ও জুম জীবনের পরিচয়ও আছে। সব গীতিকায় কমবেশি সমাজচিত্র আছে। গীতিকাগুলো গবেষণা করলে চাকমা সামাজিক ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া যাবে।

চাকমা লোকসাহিত্যে আরো কয়েকটি গীতিকার নাম পাওয়া যায়। যেমন সনাধন পানপুদি পালা, কুগিকাবা বা চরামিত্তু পালা, সৃষ্টি পত্তম, স্বর্ণপালা, লক্ষ্মীচরিত্র ইত্যাদি।

ধর্মসম্পৃক্ত লোকসাহিত্য

চাকমা লোকসাহিত্যে ধর্মকেন্দ্রিক বেশ কিছু রচনা আছে।

ক. সাদেংগিরির উপাখ্যান :

মধ্যযুগে (১৬০০-১৯০০) রচিত বেনামী রচনা সাদেংগিরির উপাখ্যান 'বুদ্ধলামা' নামে পরিচিত। 'সমগ্র উপাখ্যানের ছন্দগঠন ছড়ার, উপমা অলংকার সবই চাকমাসমাজ ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে আহৃত। এ উপাখ্যান মহাযানী বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত আগরতারার সাদেংগিরি তারারই কাব্যরূপ। তাই 'বুদ্ধলামা' নাম হলেও এতে ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এমন কি হিন্দু পৌরাণিক দেবতার সাথে লৌকিক দেবতার উপস্থিতিও লক্ষণীয়। এর মূল বক্তব্য হলো, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কর্মফলের স্বরূপ বর্ণনা। বিশেষ করে ধর্ম চক্ষু যে মানুষকে ধর্ম বহির্ভূত বা পাপী বলে সন্দেহ করে, মৃত্যুর পরে তার কী যে করুণ অবস্থা হয় তারই মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায়। লক্ষণীয় যে, এ নরক কল্পনা রামায়ণোক্ত রামের নরক দর্শনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্ভবত মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমত ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মমত এ দুয়ের পারস্পরিক প্রভাব ও সম্পর্ক থাকাতে হীনযান বৌদ্ধ ধর্মাদর্শের সাথে মিলে না। চাকমা সমাজে এ উপাখ্যান মানুষের মৃত্যুর পর শ্মশানে পাঠ করা হতো। আমাদের মনুষ্য শরীর যে নশ্বর তার কিছু বর্ণনা নিম্নরূপ :

কুলোত মাল্ল্যা পান্যা সাব। জুরো পোরি যার রান্ন্যা ছাব ॥
দুরি ছিনি হাল্লোং পোল। গদা কেইয়্যন জুরো হ্ল ॥
যক্কে হাদিবে দ্বিবে চোগ। লোরি যেব' কেইয়্যা ধক ॥
সংসার ন দেবে চোগে দি। কধা ন শুনিবে কানে দি ॥
বোয়ের ন যেব নাগে দি। কধা ন এব মুয়ে দি ॥
বল ন থেব লোরিবার। গিরিত কুর নেই তরিবার ॥...

অর্থাৎ হিমশীতল মৃত্যু যখন ঘনিয়ে আসবে, প্রাণটা ছিঁড়ে পড়বে। যখন দুটো চোখ মুছবে, শরীরের গড়ন সব নড়ে যাবে; সংসার আর চোখে দেখবে না, কথাও কানে শুনবে না। শ্বাস-প্রশ্বাস বইবে না নাক দিয়ে। মুখ দিয়ে কথাও বেরুবে না।

এতটুকু সামর্থ থাকবে না নড়ার। আর যে সব ধন সম্পদ অর্থ জমিয়েছ, তাও তোমার নিজের থাকবে না।' (সুহৃদ ২০০৫ : ১০৩-১০৪)

খ. গোঝেনলামা

১৭৭৭ খ্রিস্টাব্দে শিবচরণ চাকমা রচিত 'গোঝেন লামা' জনপ্রিয় একটি পালা। সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমা জাতি' (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা ১৯০৯) গ্রন্থে 'গোঝেন লামা' প্রথম প্রকাশিত হয়। বিরাজমোহন দেওয়ানের 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত (১৯৬৯) গ্রন্থেও গোঝেন লামা সংকলিত হয়েছে। ১৯৭৫ সালে জুভাপ্রদ থেকে 'গোঝেন লামা' স্বতন্ত্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। জানা যায় মূলে সাতটি লামা ছিল। কিন্তু একটি লামা সংগ্রহ করা সম্ভবপর হয়নি। মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত 'গোঝেন লামা'য় সেকালের সামাজিক পরিবর্তনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। (শর্মা ২০০৮ : ১১-১২) ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে গোঝেন লামার ভাষা 'চাকমা কথ্য ভাষার ছাঁচে ঢালা। রচনার মধ্যে কোথাও কষ্ট কল্পনা নাই। নিহিত ভাবগুলি স্বভাবসিদ্ধ দ্যোতনা চমৎকার। গীতগুলির মধ্যে প্রাণের যে ব্যাকুলতা পুনঃপুনঃ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা সমগ্র চাকমা বৌদ্ধ জাতিরই নিভৃত হৃদয়ের বেদনা। (বড়ুয়া ১৩৪৭ : ১৮৪)

বিরাজমোহন দেওয়ান প্রাচীন লোকসাহিত্য অধ্যায়ে প্রথমেই গোঝেন লামার আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন 'গোঝেন লামায় দেখিতে পাই পরম জ্ঞান পিপাসার সাথে সাথে শাস্ত্র ও ভাষা অধ্যয়নের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও গোঁসাই-এর চরণ ভজনা করিয়া মনোবাঞ্ছাপূরক বিভিন্ন বর ভিক্ষা। গোঁসাই অর্থে এইখানে পরমেশ্বরকেই জ্ঞাপিত করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা গোঁসাই বা গোঁয়াই অর্থে ভগবান বুদ্ধকেই জানেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে মতভেদ থাকিলেও সরল গৃহস্থরা ঐ ধর্মবিশ্বাস হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই।' (বিরাজ ২০০৫ : ১৮৫)

সুহৃদ চাকমার বিচারে 'শিবচরণের এ পালা মহাযান প্রভাবিত বৌদ্ধ ধর্ম মতের রচনা, যেহেতু শিবচরণ চাকমা ছ'লামাতে নিজেই বলেন :

হুধু গেলা সঙ্গী ভেই? সাদি সমারে চলি যেই ॥ ...

সমগ্র পালাটির সমাজ মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই সন্দেহের উদ্রেক করে যে, চাকমাসমাজ তখন জুম চাষের বদলে আধুনিক হাল কৃষির দিকে এগুচ্ছিল কিংবা জুম চাষ প্রচুর সম্পদ উৎপন্ন হয়ে তাদের চাহিদা মিটিয়েও কিছু সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকছিল, যার জন্য সমাজ ক্রমশ একটা পরিবর্তনের দিকে আসছিল। মার্কসীয় দৃষ্টিতে তাকে সামন্তবাদ বা আধাপুঁজিবাদে উত্তরণই বলা যাবে। যেহেতু শিবচরণের প্রার্থনার স্তূপ জমেছে যে তার সব প্রাপক বা লাভকারীকে একটি পুরোপুরি স্বয়ম্ভু সামন্তপ্রভু ছাড়া আর কিছুই বলা যাবে না।' (সুহৃদ ২০০৫ : ১০৫-১০৬)

গোঝেন লামা'র তৃতীয় লামাটি নিম্নরূপ :

তদাত বেরেই কাবরে
আরাধনা গরঙর আধ জুরে।
দুখ্যা কূলে ন যেদুং
সুখ্যা কূলে মুই এদুং
আহ্‌ধে ন গোত্তুং জীববধ
যুগে যুগে ন পোত্তুং দোজগত
পরম ব্যাধি মর-ন' অধ',
চিদে চজ্জা-ন থেদ';
কধা-ন' কধ তলেদি
লোগে-ন-গত্তাক কলংগী।
রোগে ব্যাধিয়ে ন' ধত্ত
অজল নীজ' দাত-ন' অধ';
পরা-ন' পেধুং ধনেদি
উনা-ন' উধুং জনেদি;
অবুঝ জন্ম-ন' ওধুং
তিদে কধা-ন' শুন্দুং।
কানে-ন' শুন্দুং কুকধা
পরে-ন' কধ' অকধা;
পোরবো পোতি যেই দেঝে
জন্ম ওধুং গোই সেই দেঝে
আরনি রাজার দেচ্ লাক-ন' পাং;
অঘাদে অপধে যেই ন' পাং।
মেধক চিদে থায় ন' জান্দুং
বেধক পরাত-ন' পোত্তুং।
গীদ' তিন লামা ফুরেলুং
সভারে সালাম জানেলুং।

বাংলা অনুবাদ :

গলায় জড়িয়ে কাপড়ে
আরাধনা করছি হাতজোড়ে।
দুঃখী কুলে না যেতাম
সুখের কুলে আমি আসতাম।
হাতে না করতাম জীববধ
যুগে যুগে না পড়তাম নরকে।
পরম ব্যাধি মোর না হত
চিন্তা ভাবনা না থাকত।

কথা না বলত নেপথ্যে
লোকে না করত কলংকী।
রোগে শোকে না ধরত
উঁচু-নিচু দাঁত না হত।
অভাব না পেতাম ধন দিয়ে
কম না হত জন দিয়ে।
অবুঝ জন্মে না হতাম
তিক্ত কথা না শুনতাম।
কানে না শুনতাম কুকথা
লোকে না বলত অকথা।
পড়ুয়া পতি যেই দেশে
জন্ম নিতাম সেই দেশে।
পরাজিত রাজার দেশ না পেতাম
অঘাটে অপথে না হাঁটতাম।
যত চিন্তা আছে না জানতাম
বে-পাকে যাতে না পড়তাম।
গীতের তিন লামা শেষ করলাম
সবাইকে সালাম জানালাম।

প্রবাদ

লোকসাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা প্রবাদ। প্রবাদের নানা সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। নানা রকম বিশ্লেষণও দেয়া হয়েছে। যেমন :

১.'প্রবাদ বা প্রবচন জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ততম রসাভিব্যক্তি, ইহা এক দিক দিয়া যেমন প্রাচীন, আবার তেমনই অন্য দিক দিয়া আধুনিক, ইহা পূর্ব হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া প্রাচীন আবার প্রচলিত মনোভাব প্রকাশ করিতেও সহায়তা করিতেছে বলিয়া আধুনিক।' (আশুতোষ ২০০৪ : ৫০০)

২. 'মানব জীবনের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা, ভূয়োদর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে প্রবাদ ও প্রবচন পরিবৃদ্ধি লাভ করে আসছে। বিরাট বিস্তৃত বিপুল পৃথিবী-নানা ধর্ম-নানা জাতি-নানা সামাজিক ও সাংসারিক আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ পরিবর্ধিত হয়, কাজেই তাদের অভিজ্ঞতা ও প্রবাদও বহু বিচিত্র। জার্মান দেশে প্রবাদ সম্বন্ধেও একটি প্রবাদ আছে : As the country, so the proverb-অর্থাৎ যেমন মানুষ তেমনি প্রবাদ। প্রবাদের মাধ্যমে একটি জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকে আবিষ্কার করা যায়।' (সিদ্দিকী ১৯৯৪ : ২৫)

৩. 'আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা হইতেই প্রবাদের উৎপত্তি। এক একটি প্রবাদ অনেকখানি অভিজ্ঞতার নির্যাস। একদিন একজন নিজের অভিজ্ঞতা হইতে নিজের চিন্তার ফলে, একটি সুন্দর ভাব একটি সুন্দর কথায় ব্যক্ত করিল—যাহারা শুনিল তাহাদের মনে ইহা বিঁধিয়া গেল। তারপর উপযুক্ত ক্ষেত্রে তাহারা ইহার প্রয়োগ করিতে লাগিল। যার জন্ম দু'চার জনের মধ্যে তাহা ক্রমশঃ সমগ্র সমাজে ছড়াইয়া পড়িল। একের অভিজ্ঞতায় ইহার জন্ম, বহুর ব্যবহারে ইহার জীবন।' (শশিমোহন ১৯৭০ : ক. ভূমিকা)

প্রবাদের উৎপত্তি হয়েছে সুপ্রাচীন কালে। একটি মৌখিক সাহিত্যের একটি শাখা।

প্রবাদ প্রবচনকে চাকমারা বলে 'দাগ কধা' অর্থাৎ ডাকের কথা। বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান তাঁর 'চাকমা প্রবচন বাগ্‌ধারা ও ধাঁধা' (২০০৫) গ্রন্থের ভূমিকায়

লিখেছেন, 'আমাদের চাকমা সমাজে বহু 'দাগকধা' (প্রবচন) ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এগুলো আমরা এখন ভুলতে বসেছি। গ্রামাঞ্চলে মেলা মজলিশে হঠাৎ করে এখনো যা দুয়েকটা দাগকধা কানে আসে। বলাবাহুল্য যে গাঁয়ের বুড়োবুড়ীরাই শুধু এখন এসবের ধারক আর বাহক। ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে দাগকধাগুলো উন্নত জাতিসত্তার পরিচয় বহন করে। সব জাতের মধ্যে দাগকধা পাওয়া যায় না। সে হিসেবে চাকমারা এখন উপজাতি আখ্যায়িত হলেও দাগকধাগুলি নিঃসন্দেহে তাদের সুপ্রাচীন জাতীয় ঐতিহ্যের সাক্ষ্য দেয়। ... চাকমা দাগকধাগুলো খুবই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। অল্প কিছু দাগকধা বাংলা ভাষা থেকেও এসে গেছে। সেগুলো সহজে চেনা যাবে। নিখুঁত চাকমা দাগকধাগুলো পরিপূর্ণ চাকমা ভাবধারা মতে গঠিত।'

যে জাতির লোকসংস্কৃতি সমৃদ্ধ সে জাতি উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। চাকমা জাতির লোকসংস্কৃতির সকল দিকই সমৃদ্ধ। তাদের প্রবাদ প্রবচন প্রমাণ করে তারা একটি প্রাচীন জাতি, প্রাচীন সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

সতীশ চন্দ্র ঘোষ তাঁর 'চাকমা জাতি' (কলকাতা ১৯০৯) গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদ-এর দ্বিতীয়াংশে চাকমা প্রবাদ নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থে বঙ্গানুবাদ সহ পঞ্চাশটি চাকমা প্রবাদ সংকলিত হয়েছে। তিনিই প্রথম চাকমা প্রবাদ সংগ্রাহক ও সংকলক।

আবদুস সাত্তার 'আরণ্য জনপদে' (১৯৬৬, ২য় সংস্করণ ১৯৭৫) গ্রন্থে বঙ্গানুবাদ সহ সাতটি চাকমা প্রবাদ সংকলন করেছেন। তিনি চাকমা প্রবাদগুলোকে লোকসাহিত্যের অমূল্য রত্ন অভিহিত করে বলেছেন, "এসব প্রবাদের সঙ্গে বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের প্রবাদের অর্থগত মিল থাকলেও চাকমা ভাষার রূপমাধুর্যে এসব যেন আরো বৈশিষ্ট্যময় হয়েছে।" (সাত্তার ১৯৭৫ : ১১৩)

'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' (১৯৬৯) গ্রন্থে বিরাজমোহন দেওয়ান চাকমাদের 'ডাগর কদা'র উল্লেখ করে ভাবার্থসহ বারটি চাকমা প্রবাদ সংকলন করেছেন।

বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান দীর্ঘদিন ধরে চাকমা প্রবাদ সংগ্রহ করেছেন, বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। ১৯৭৪ সালে তিনি ১৪৫টি দাগকধা বাংলা একাডেমীতে পাঠিয়েছিলেন। ১৪৩টি দাগকধা বাংলা একাডেমী গ্রহণ করে (সূত্র পত্র সংখ্যা ১০০৪২/বা/এ তারিখ ৮/৫/৭৪ইং)। তাঁর সংগৃহীত 'দাগকধা' ১৯৮৪ সালের জুন মাসে রাঙ্গামাটির উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট এর ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'গিরিনির্ঝর' ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর ২০০৫ সালে উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত তাঁর 'চাকমা প্রবাদ প্রবচন বাগধারা ও ধাঁধাঁ' (প্রকৃতপক্ষে হবে ধাঁধা) গ্রন্থে তাঁর সংগৃহীত ৩৮৬টি চাকমা প্রবাদ সংকলিত হয়েছে।

সুগত চাকমার 'চাকমা পরিচিতি' (১৯৮৩) গ্রন্থে পাঁচটি এবং 'বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য' (২০০২) গ্রন্থে সতেরটি চাকমা প্রবাদ বঙ্গানুবাদ সহ সংকলিত হয়েছে।

জাফার আহমাদ হানাফীর 'উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি' (১৯৯৩) গ্রন্থে-বঙ্গানুবাদ সহ বিশটি চাকমা প্রবাদ সংকলিত হয়েছে।

সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা 'পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি' (১৯৯৪) গ্রন্থে তিনটি চাকমা প্রবাদ সংকলন করেছেন এবং প্রবাদ তিনটি সৃষ্টির কাহিনীও বর্ণনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চাকমার 'চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি' (১৯৯৮) গ্রন্থে ভাবার্থ সহ তেরটি চাকমা প্রবাদ সংকলিত হয়েছে।

চাকমা প্রবাদ নিয়ে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন ড. দুলাল চৌধুরী। তাঁর 'চাকমা প্রবাদ' (কলকাতা ১৯৮০) গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে চাকমাদের বিস্তারণভূমি, চাকমা জাতি ও সমাজ, লোকাচার, প্রবাদের উৎস, প্রবাদের সংজ্ঞা, প্রবাদের বিকাশ, রূপ ও রীতি, প্রবাদে সমাজচিত্র, প্রবাদের ছন্দ এবং উৎস থেকে মোহনায়। এ গ্রন্থে তিনি ৩৯৪টি চাকমা প্রবাদ, ৯০টি চট্টগ্রামের প্রবাদ এবং পরিশিষ্টতে ২২টি চাকমা প্রবাদ (ত্রিপুরা) ও ১০০টি চট্টগ্রামের প্রবাদ সংকলন করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি যথার্থই বলেছেন 'প্রবাদ মানুষের প্রাজ্ঞমনস্কতার স্বর্ণফসল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে সুগভীর দার্শনিক প্রত্যয় একদিন সামাজিক মানুষ আয়ত্ত করলো তারই ফলশ্রুতি প্রবাদ। গ্রামীণ মানুষ সুদীর্ঘকাল ধরে নিজের পরিবেশ, প্রকৃতি, সমাজ সম্পর্কে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, তারই সংক্ষিপ্ত বাণী প্রবচন। কাল প্রবাহে ও লোকসমাজের স্মৃতি বাহিত হয়ে নানা ঘাত প্রতিঘাত বা উত্থান পতনে প্রবাদ আরো জীবনদর্শন ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে। গ্রাম্যমানুষের মুখ নিঃসৃতবাণী বলেই প্রবাদের ভাষাও হয়েছে গ্রাম্যভাষায় অনুবর্তী। সেই জন্য প্রবাদ প্রবচন লোকভাষার যথার্থ নিদর্শন। আঞ্চলিক সমাজজীবনের বহু অমূল্য উপকরণ বিধৃত হয়েছে প্রবাদে। প্রবাদকে মানব সমাজের প্রত্নসাহিত্যও বলা চলে। সমাজবিজ্ঞান ও সমাজইতিহাস নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রবাদের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। ...প্রবাদ প্রবচন আদিতে ছিল কাহিনীমূলক। জীবনসম্পৃক্ত গল্প বা কাহিনী কালক্রমে হারিয়ে গিয়ে শুধু সেই গল্পের বা জীবন বৃত্তান্তের নির্যাসটুকু আমাদের লোকসাহিত্যে অমর হয়ে রয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেক কোমজাতির সমৃদ্ধ প্রবাদ প্রবচন রয়েছে। ধাঁধা প্রকর্ষিত মনন ও দর্শনের ফলশ্রুতি। যে কোন জনগোষ্ঠী বা লোকসমাজে প্রবাদ বা ধাঁধা সহজলভ্য নয়। সুতরাং চাকমা সমাজে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনগুলি তাদের উন্নত সংস্কৃতিমনস্কতার পরিচয় বহন করে।' (দুলাল ১৯৮০ : ১৯-২০)

ড. দুলাল চৌধুরী চাকমা প্রবাদকে সাতভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা কৃষিমূলক, পশুপক্ষী বিষয়ক, প্রকৃতি বিষয়ক, ধর্ম বিষয়ক, সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক, দেহ ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক এবং বিবিধ (উৎস, পার্বণ, বিবাহ, চুরি ইত্যাদি)। এই শ্রেণীকরণ যৌক্তিক।

নন্দলাল শর্মার 'চাকমা প্রবাদ' (২০০৭) গ্রন্থে চারশত চুয়াত্তরটি চাকমা প্রবাদ (বাংলা অনুবাদ সহ) সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থের প্রসঙ্গকথায় প্রবাদ সম্পর্কে আলোচনা আছে।

প্রবাদবাক্যে একটি জাতির জীবন চর্যার সংক্ষিপ্ত অথচ তাৎপর্যময় অভিব্যক্তি প্রকাশিত হয়। চাকমা সমাজে প্রবাদের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অনেকটি প্রবাদ বাংলা বা ইংরেজি প্রবাদের সঙ্গে তুলনীয়। আবার কিছু প্রবাদ আছে চাকমা সমাজের একান্ত নিজস্ব। যেমন—

ক. আরাত আরা আবুঝে
খ. উগুরে উগুরে বোয়ের যায়
কলগ' মাদিয়্যে থান ন পায়।
গ. রনু খাঁ আমল মিধা।

একটি সংস্কৃতিবান জাতি বলেই চাকমাদের নিজস্ব প্রবাদ প্রবচন সৃষ্টি হয়েছে।

চাকমা সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সেখানেও বিয়ের পর নারী স্বামীগৃহে চলে যায়। সেই বাড়িই তার নিজের বাড়ি। তখন বাপের বাড়ির চেয়ে স্বামীর বাড়ির স্বার্থরক্ষাই তার কাছে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রসঙ্গে চাকমা সমাজে একটি বহুল প্রচলিত প্রবাদ-

যে নত্ উধে সে ন' পানি ঈঝে।

অর্থাৎ যে নৌকায় উঠে, সে নৌকার পানি সেচন করে। নৌকার আরোহীকে নৌকা রক্ষা করতে হয়। তাই নৌকার ছিদ্র দিয়ে পানি উঠলে তা অপসারণের দায়িত্ব আরোহীর। সংসারে পরিবার হল নৌকাসদৃশ। পরিবারের সকল স্বার্থ সংরক্ষণ, পরিবারের সকল সদস্যের ভালোমন্দের সঙ্গে সে তখন জড়িয়ে পড়ে। কাজেই এ পরিবারের স্বার্থ তাকে সংরক্ষণ করতেই হয়।

শ্বশুরবাড়ি নারীর জন্য এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। বাপের বাড়ির চির পরিচিত পরিবেশ ছেড়ে নারীকে নতুন পরিবেশে নতুন জীবন যাত্রার সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। দীর্ঘ দিনের অভ্যাস ও রীতিনীতি বিসর্জন দিয়ে তাকে নতুন অভ্যাস ও রীতিনীতি গ্রহণ করতে হয়। এ সময় স্বামীর পরিবারের লোকজনের সহায়তা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সহায়তা কেউ লাভ করে, কেউ লাভ করে না। শাশুড়ি ও ননদিনীর সঙ্গে নতুন বৌয়ের সম্পর্ক ষোড়শ শতাব্দীর কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে আছে। কালকেতু ফুল্লরাকে বলেছে—

শাশুড়ি ননদী নাই নাই তোর সতা
কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলে রাতা।

শাশুড়ি বৌকে সরাসরি কোন কিছু না বলে অনেক সময় তার কুমারী মেয়ের উপর প্রয়োগ করে ইঙ্গিতে বৌকে শিক্ষা দান করে থাকেন। আর এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে প্রবাদ 'ঝিকে মেরে বৌকে শেখানো'। প্রাচীন চাকমা লোকসমাজের শাশুড়িগণও বৌদের সঙ্গে এমনি আচরণই করতেন। তাই সৃষ্টি হয়েছে—

ঝিয়ারে মারি বৌরে শিগায়।

নারীর অপরিমিত আহার আমাদের দেশে চরম নিন্দনীয়। চাকমা সমাজও এর ব্যতিক্রম নয়। এ ব্যাপারকে নিন্দা করেই প্রবাদ রচিত হয়েছে—

মিলা রেক্ষচ্ পিলা দাঙ্র।

অর্থাৎ স্ত্রীলোক পেটুক হলে বড় হাঁড়িতেই রান্না চাপানো হয়ে থাকে। অবশ্য বড় হাঁড়িতে রান্না করা খাবার কেবল মহিলারাই গ্রহণ করেন না, পুরুষেরাও গ্রহণ করেন। কিন্তু পুরুষের অধিক আহার্য গ্রহণ দোষের নয়। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী এটাও লক্ষ্য করেছিলেন। কালকেতুর শয়ন ও ভোজন সম্পর্কে তিনি বলেছেন—

শয়ন কুৎসিৎ বীরের ভোজন বিটকাল
গ্রাসগুলি তুলে যেন তে আঁটিয়া তাল।

পুরুষের অধিক আহার দূষণীয় নয়। কাজেই মোটা হাঁড়িতে রান্না করার দোষতো নারীকে বহন করতেই হবে। তাই রাক্ষস অভিধাতো তার কপালেই জুটবে।

বড় ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিয়ে করা চাকমা সমাজে বৈধ। বড় ভাইয়ের স্ত্রী ও দেবর হচ্ছে 'খেল্যা কুদুম' অর্থাৎ তাদের মধ্যে রয়েছে ঠাট্টার সম্পর্ক। 'দেবর' শব্দটি দ্বিতীয় বর থেকে সৃষ্ট বলে অনেকের ধারণা। আর হয়তো এ কারণে প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে—

ভোজ কদে আধা মোগ।

অর্থাৎ ভোজ (বড় ভাইয়ের স্ত্রী) বলতে অর্ধেক স্ত্রী। কিন্তু ভোজের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ দুঃখের কারণ হতে পারে। লোকবিশ্বাস ও লোক অভিজ্ঞতা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে এই প্রবাদটি—

ভোজ আঝায় মোগ গেল
মোগ আঝায় ভোজ গেল।

অর্থাৎ ভোজের আশায় স্ত্রী গেল, স্ত্রীর আশায় ভোজও গেল। দু'নায়ে পা দেয়ার ফল এমনই হয়। স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ত না থেকে ভোজের অনুগত হলে স্ত্রী হারানোর সম্ভাবনা থাকে। স্ত্রীর সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ভোজও হাতছাড়া-উভয় কূল হারানো।

স্ত্রীকে অর্ধাঙ্গী বা Better half বলা হয়। বস্তুত পুরুষের জীবনে পূর্ণতা লাভ হয় দার পরিগ্রহণে। মনমত স্ত্রী লাভ সৌভাগ্যের বিষয়। কারণ 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে'। কিন্তু অনেকের ভাগ্যে যথাসময়ে বৌ জোটে না। বয়স বেশি হয়ে গেলে যেন তেন একটি পাত্রী গ্রহণেও আপত্তি থাকে না। চাকমা প্রবাদে বলা হয়েছে—

নেই মোগত্তুন কান মোগ ভালা
সবায় ন পাধে রাজাঝি ভালা।

অর্থাৎ মোটেই স্ত্রী না জোটার চেয়ে কানা স্ত্রী জোটা ভালা। আর সেটিও না জুটলে রাজকন্যাও ভাল। এখানে রাজকন্যা বলতে কাজ না জানা অকর্মণ্য নারী বোঝানো হয়েছে।

চাকমা সমাজে নারীরা পুরুষদের চেয়ে কঠোর পরিশ্রম করে। গৃহকর্ম তো নারীদের অবশ্য করণীয়। এসব দায়িত্ব পালন করার পরও জুমচাষ,বাজার করা, পানি ও জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের মতো কঠোর কায়িক শ্রম তাদের করতে হয়। রাজকন্যাতো এরূপ শ্রম করতে পারে না। তাই অকর্মণ্য নারী বোঝাতে রাজকন্যা শব্দটির প্রয়োগ।

স্ত্রী ভাগ্যে ধন আর পুরুষের ভাগ্যে জন। যেমন পুরুষ তেমন স্ত্রী ভাগ্যে জোটে। এর থেকেই প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে—

যার লাগ তার ভাগ।

সন্তানের উপর মায়ের প্রভাব বেশি। বাংলা প্রবাদে আছে 'মা গুণে ঝি, গাই গুণে ঘি' চাকমা সমাজেও এই সত্যতা উপলব্ধ হয়েছে। এর প্রমাণ এই প্রবাদটি—

বাপ চা পুত চা
মা চা ঝি চা।

অর্থাৎ ছেলে বাপের মত আর মেয়ে হয় মায়ের মত। এ জন্য বিয়ের সময় কনের মায়ের গুণ বংশ প্রভৃতি দেখা হয়ে থাকে। কনের উপর মায়ের প্রভাব যে বেশি থাকে প্রবাদ বাক্যে তা স্বীকৃত। কিন্তু সৎমা? সৎমা বলতে চাকমা প্রবাদেও নেতিবাচক উক্তি পাওয়া যায়।

সাদাঙা কলে আদাঙা উরে।.

অর্থাৎ সৎমা বলতে আত্মা খাঁচা ছেড়ে চলে যায়।

গ্রামীণ চাকমা সমাজের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায় কৃষি কাজ। কৃষি বলতে জুম চাষ। তাই কৃষি ও জুম চাষ বিষয়ক বেশ কিছু প্রবাদ চাকমা সমাজে প্রচলিত আছে।

অখে খাং; আর জুমত উধে।

যা খুব খাই, তা আবার জুম ক্ষেত্রে এমনিই হয়। জুম ক্ষেত্রে সব ফসলের চাষ হয়। এককালে জুমচাষে চাকমাদের যে জীবিকা ভালভাবে নির্বাহ হত, প্রবাদটি তারই সাক্ষ্য দেয়।

আষাঢ় মাস কলার চারা রোপণের উত্তম সময়। এসময় কলার চারা রোপণ করলে ঝাড় বড় হয়। এত বেশি কলা উৎপন্ন হয় যে তা খেয়ে শেষ করা যায় না, বাজারে নিয়ে বিক্রি করতে হয়। তাই সৃষ্টি হয়েছে চাকমা প্রবাদ—

আঝার কলা বাজারত যায়।

কলা চাষের জন্য কার্তিক মাসও উত্তম। এ সময়ে লাগানো কলার ঝাড় এত ঘন যে হাতিতে তা ঠেলতে পারে না। অর্থাৎ-

কাতির কলা আহতিয়্যে থেলি ন পারে।

চাষবাস করাকে চাকমারা উত্তম কাজ মনে করেন। তাই সৃষ্ট হয়েছে প্রবাদ—

এক তুলে খেদে
আর তুলে পুদে।

ভোজনবিলাসীরা পুরানো জুম ক্ষেতের বেগুন দিয়ে ঘন্যা মাছের শুটকির তরকারি খুব পছন্দ করেন। তার প্রমাণ আছে একটি প্রবাদে—

এহরা মাছ দাবানা সাচ
রান্যা বিগুন ঘন্যা মাছ।

খড়ে যতক্ষণ ধান থাকে ততক্ষণ নাড়াচাড়া করে ধান সংগ্রহ করতে হয়। ধান শেষ হয়ে গেলে খড় নাড়াচাড়া অর্থহীন। একথা বোঝাতে সৃষ্ট হয়েছে প্রবাদ—

ধান নেই খের কি ঝারাঝারি।

ধানকে সেরা ধন বলা হয়েছে 'ধান সে ধন' প্রবাদে। ধান যার আছে সে ধনী—

যাত্তুন আঘে ধান
তা কধানি তান।

চাকমা প্রবাদে লোকজীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। চাকমা প্রবাদ চাকমা জাতির অবশ্যই গর্বের ধন। (শর্মা ২০০৭ : ১২-২০)

ধাঁধা

লোকসাহিত্যের একটি মজার অংশ হচ্ছে ধাঁধা। এটি আকারে একেবারে সংক্ষিপ্ত। এর মধ্যে একটি রহস্য থাকে যা শ্রোতাকে ভেদ করতে হয়। বক্তা প্রশ্ন করেন। উত্তর জানা থাকলে শ্রোতা তাড়াতাড়ি জবাব দেন নতুবা ভাবতে শুরু করেন। ধাঁধার মধ্যে সূক্ষ্মবুদ্ধি ও চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। লোকজীবনে যারা এর রচয়িতা তাদের বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। ধাঁধায় সাধারণত একটিমাত্র ভাব থাকে। এই ভাব রূপকের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। রূপকের আচরণ ভেদ করে এর রহস্য উন্মোচন করতে হয়। ধাঁধার মধ্যে কখনও কখনও হাস্যরসের পরিচয়ও পাওয়া যায়। প্রাত্যহিক জীবনের যে কোনো বিষয় অবলম্বন করেই ধাঁধা রচিত হতে পারে। দৈনন্দিন জীবন যাত্রার বিষয়, শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রকৃতি, জীবজন্তু, পাখি, কীট-পতঙ্গ যে কোন বিষয় নিয়ে ধাঁধা সৃষ্টি হতে পারে। বস্তুত ধাঁধাতে 'দুইটি বস্তুর মধ্যে একটি সামঞ্জস্য কল্পনা করিয়া প্রকৃত মীমাংসাটি একটি সুচতুর বর্ণনা দ্বারা গোপন করিয়া দেওয়া হয়। এই বর্ণনার রঙিন জালটি উন্মোচন করিয়া দিলেই প্রকৃত মীমাংসাটির সঙ্গে সহসা মুখোমুখি হওয়া যায়-একটি পরিচিত অথচ গোপন বস্তুর সঙ্গে আকস্মিক মুখোমুখি হইয়া যাইবার আনন্দ উচ্ছ্বসিত হাস্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে; প্রথম অধিকাংশ ক্ষেত্রে কেহই ভাবিয়া কিংবা চিন্তা করিয়া ইহাদের মীমাংসা করে না, ইহাদের মীমাংসাগুলি ইহাদের সঙ্গে সঙ্গেই জনশ্রুতির ভিতর দিয়া প্রচারিত হইয়া থাকে; তবে এই প্রচারের মধ্যে দিয়া জিজ্ঞাসাগুলি প্রকাশ্যভাবে থাকে এবং ইহাদের মীমাংসাগুলি প্রচ্ছন্নভাবে থাকে মাত্র'। (আশুতোষ ২০০৪:৪৫৪)।

চাকমা লোকসাহিত্যে ধাঁধাকে 'বানাহ্' বলা হয়। সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমা জাতি' (১৯০৯) গ্রন্থের ঊনবিংশ পরিচ্ছেদের তৃতীয় অধ্যায়ে হেঁয়ালী বা 'বানাহ্' সম্পর্কে আলোচনা আছে। তিনি ছাব্বিশটি ধাঁধা সংকলন করেছেন। আবদুস সাত্তারের 'আরণ্য জনপদে' (১৯৬৬) গ্রন্থে দশটি ও 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য' (১৯৭৮) গ্রন্থে তিনটি চাকমা ধাঁধা আছে। বিরাজমোহন দেওয়ানের 'চাকমাজাতির ইতিবৃত্ত' (১৯৬৯) গ্রন্থে আটটি, জাফার আহমাদ হানাফীর 'উপজাতীয় নন্দন

সংস্কৃতি' (১৯৯৩) গ্রন্থে দশটি, বঙ্কিমচন্দ্র চাকমার 'চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি' (১৯৯৮) গ্রন্থে তেরটি, সুগত চাকমার 'বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য' (২০০২) গ্রন্থে তেইশটি এবং বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ানের 'চাকমা প্রবাদ প্রবচন, বাগধারা ও ধাঁধা' (২০০৫) গ্রন্থে আটষট্টিটি চাকমা ধাঁধা সংকলিত হয়েছে। সমৃদ্ধ চাকমা লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারে এতো কম ধাঁধা থাকতে পারে না। অনুসন্ধান করলে আরো অনেক ধাঁধা সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন প্রাণী, ফল, গৃহস্থালির সামগ্রী, গাছপালা, দেহের অঙ্গপ্রতঙ্গ প্রকৃতি প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে চাকমা ধাঁধা রচিত হয়েছে। অনেক ধাঁধার সঙ্গে বাংলা বা অন্যান্য ভাষার ধাঁধার মিল আছে। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় একই বিষয় নিয়ে ধাঁধা প্রচলিত আছে। আবার একান্তভাবেই আদিবাসী জীবনধারা নিয়েও চাকমা ভাষায় ধাঁধা রচিত হয়েছে যার উদাহরণ অন্য ভাষার ধাঁধায় পাওয়া যাবে না। এ রকম কয়েকটি ধাঁধা হল—

১. এ কুয়া পানি ও কুয়াত যায়
মধ্য কুয়াবো চুগুনা থায়।
এ কুয়ার পানি ঐ কুয়ায় যায়
মাঝের কুয়া শুকনা থাকে।

ধাঁধাটির জবাব জল মদ প্রস্তুত করা। 'মদ চোয়ানো গরম পাত্রের জল বাষ্প হয়ে একটা নলের ভেতর দিয়ে গিয়ে আরেকটা ঠাণ্ডাপাত্রে পড়ে। মাঝের নলে কিন্তু কোন জল জমা হওয়ার অবকাশ থাকে না। (বঙ্কিমকৃষ্ণ ২০০৫ : ৯৩)

২. এহ্‌দও নয় শরদা আঘে
বাঘ নয় গুজুরে, পক্ষী নয় উরে।
হাতি নয় শুঁড় আছে
বাঘ নয় গর্জন করে, পাখি নয় উড়ে।

জবাব : কুমুরেং পুক বা কোমেরেং পোকা। বাঁশ কড়ুলের মধ্যে জন্ম এবং কড়ুল খেয়ে বড় হয়ে এক সময় ঐ পোকা উড়ে যায়। দেখতে অনেকটা একটা ক্ষুদ্র হাতির মত। শুঁড় আছে এবং উড়তে পারে। ওড়ার সময় যে শব্দ হয় তা দূরাগত বাঘের গর্জন বলে ভ্রম হয়। (বঙ্কিমকৃষ্ণ ২০০৫:৯৪)

৩. গুজং বুজ্যা লংখরং
থেং দি চা লেং গরং
কুঁজো বুড়া কেন খাড়া
পা দিয়ে দেখ করব খোঁড়া।

জবাব : ঈধি; 'এটি এক প্রকার ফাঁদ। গাছ বা বাঁশের কঞ্চি এক মাথা মাটিতে ফাঁদ পাতা হয়। কোন কিছুতে ফাঁদে পা দিলেই ফাঁদ ছুটে গিয়ে শিকারকে সজোরে উপরে টেনে তোল।' (বঙ্কিমকৃষ্ণ ২০০৫:১৫)।

৪. চেখেং উভা, কাঙেলৎ লেজ
চার পা উর্দ্ধমুখী কোমরে ল্যাজ।

জবাব : ধুলোন অর্থাৎ 'পাহাড়ী শিশুদের দোলনা-চারকোনার রশিগুলো ঠ্যাংয়ের মত উপরদিকে খাড়া আর তলায় ল্যাজের মত দোলনা দোলানোর জন্যে রশিবাঁধা। (বঙ্কিমকৃষ্ণ ২০০৫:৯৫)

৫. মা কান্দে পুয়া দাঙর অহয়।
মা কাঁদতে ছেলে বড় হয়।

জবাব : 'চরকা কাটা-ঘ্যানর ঘ্যানর চরকায় শব্দ হয় আর ওদিকে টাকুতে গিয়ে সুতো জমে ওঠে।' (বঙ্কিমকৃষ্ণ ২০০৫ : ৯৬)

৬. শন চিরি সাপধায়।
শন চিরে চিরে সাপ পালায়।

জবাব : 'বিয়োং-নিকষকালো রঙের তাঁতের ছানা।' (বঙ্কিমকৃষ্ণ ২০০৫:৯৬)

বিভিন্ন ইতর প্রাণী-পশুপাখি পতঙ্গ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে চাকমা 'বানাহ্' রচিত হয়েছে। যেমন :

১. আট হাত ষোল আঁদু, মাচমারা যিয়ে সাধু
চুগুনো খালৎ ফেল্যুং জাল, মাচ মারতে পরান যার।
আট হাত ষোল হাটু, মাছ মারতে গিয়েছে সাধু
শুকনা খালে ফেললাম জাল, মাছ মারতে পরান যায়। (জবাব : মাকড়সা)

২. উগুরে মালা তলে মালা
থগদি বেরায়, ভাল ভালা।
উপরে মালা নিচে মালা
ঠেস দিয়ে বেড়ায় ভালা ভালা। (জবাব : কচ্ছপ)

৩. ওহ্লোদ ফুল চোনচোনি মালা
ধরিয়' ন' পারে বেদাগী কাদা।
হলুদ ফুল চকচকে মালা
ছোঁয়া যায় না, বেতের মত কাঁটা। (জবাব : বোলতা)

৪. খেলে এক কুরুম
ন' খেলে এক কুরুম
খেলে এক ধামা
না খেলেও এক ধামা। (জবাব : শামুক)

(কুরুম বেতের তৈরি ছোটো ধামার মত। জুমে ধান বপনের সময় এতে ধান রাখা হয়। দু'তিন কেজি ধান ধরে। দেখতে শামুকের মত।)

৫. কেদি ঝারত বাঘ থায়।
ছোট বনে বাঘ থাকে। (জবাব : উকুন)

৬. জেদা লক্কে এক, মলেহ্ দুই।
জীবিত অবস্থায় এক, মরলে দুই। (জবাব : ঝিনুক)

৭. মাধাৎ খড়গ তাল্লোৎ চুল
দজ থেং তিন লেঙুর।
মাথায় খড়গ তালুতে চুল
দশ পা, তিনটে লেজ। (জবাব : চিংড়ি)

ফল, ফুল, উদ্ভিদ ও গাছপালা বিষয়ে চাকমা বানাহ্ রচিত হয়েছে। যেমন—

১. ইজর' মাদাৎ খের কুর,
খুলি চেলে চাম্পাফুল।
ইজরের মাথায় খড়ের গাদা
খুলে দেখলে চাঁপাফুল। (জবাব : কাঁঠাল)

২. হিলত বিলত পানি নেই
গাজ' আগাৎ কুয়া।
পাহাড়ে বিলে পানি নেই
গাছের আগায় কূপ। (জবাব : নারকেল)

৩. ফেললং গুল মরিচ
উধিলাক বিরিচ গাচ
ধরিলাক বোয়ল্যা
বজর বারমাচ।
ফেললাম গোল মরিচ
উঠল বড় গাছ
ধরল বছর বারমাস। (জবাব : পেঁপে গাছ)

৪. ফেললুং কাল্যাজিরা
উধিলাক সদরক্চারা
ফুদিল মালতীফুল
ধরিলাক করঙা।
ফেললাম কালজিরা
উঠল সবুজ গাছ
ফুটল মালতীফুল
ধরল কামরাঙ্গা। (জবাব : তিল)

৫. চিগোন বুর্জ্যা, দারিহ্ ফোরর্ফোজ্যা।
ছোট বুড়া, দাড়ি ফরফরা। (জবাব : ভুট্টা)

৬. আগা লকলক্যা পাদা খচখচ্যা
ভিরেজিমা পুনান রাঙা দোকদোক্যা।
আগা লকলকে পাতা খস খসে
বিরাজের মার নিতম্ব রাঙা লাল টুকটুকে। (জবাব : মিষ্টি কুমড়ার ফুল)

৭. চাল উবুরে বর মুগর
ভাঙি ন পার্লে বর শুগর।
চালের উপরে বড় মুগুর
ভাঙাতে না পারলে বড় শূকর। (জবাব : লাউ)

৮. আগা আঘে গরা নেই
ধেলা আঘে পাদা নেই।
আগা আছে গোড়া নাই
ডাল আছে পাতা নাই। (জবাব : স্বর্ণলতা)

৯. এক পাদায় বুরাহ অহয়।
একপাতা মেলেই বুড়া। (জবাব : ব্যাঙের ছাতা)

১০. খায়দে শাগর ফুল নেই।
খাবার শাকটার ফুল নাই। (জবাব : পান)

১১. গাঙ কুলে কুলে বোরোই গাজ ঝলম্বত্যা ধরে
রাজা এত্তন বাদশা এত্তন, সালাম গুরি পড়ে।
গাঙের কূলে বরই গাছ খুব ফল ধরে
রাজা ও বাদশা সালাম করে পড়ে। (জবাব : লজ্জাবতীলতা)

১২. গাজ অহয়্যে চক্কর চক্কর, পাদা হইয়্যে শেল
যে ভাঙি ন' পারে তে গুথি শুদ্ধ গেল।
গাছ হল চক্র আঁকা পাতা যেন শেল
যে ভাঙাতে পারে না তার গোষ্ঠীশুদ্ধ গেল। (জবাব : খেজুর গাছ)

১৩. গাজ মাধ্যাৎ চিগোন সাপ
বদা পারে ঝাক ঝাক
গাছের মাথায় চিকন সাপ
ডিম পাড়ে ঝাঁকঝাঁক। (জবাব : মরিচা বেত)

১৪. গুরি লুদি বাজ
ফুল নেই, পাগোর নেই-ধরে বারমাস ।
ছোটলতা বাঁশ
ফুল নাই, পাঁপড়ি নাই, ধরে বারমাস। (জবাব : পান)

১৫. ঝারত্তুন নিহ্গিলি ভজা
পুনত্ লুধি মাধ্যাৎ পঝ।
জঙ্গল থেকে বের হল ভজা
নিতম্বে লাঠি, মাথায় বোঝা। (জনাব : আনারস)

১৬. মাধাৎ ছাদি কাঙেলং লুধি
পুনত্তলে মস্ত ইক্ক ভুদি।
মাথায় ছাতি কোমরে লাঠি
নিতম্বের নিচে মস্ত এক গাঁটরি। (জবাব : ওলকচু)

১৭. মুয়েদি পারে বদা, পুনে পারে ছ,
পল্লাপল্লি কেইয়্যান সিডা কন্না ক।
মুখে পাড়ে ডিম, নিতম্বে পাড়ে ছা
পরত পরত গা খানা এটা কি বল। (জবাব : কলাগাছ)

প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে রচিত চাকমা বানাহ্ গুলোর উদাহরণ :

১. আমপাদা ঝেরেৎ ঝেরেৎ কাখোল পাদা লেজ
উরি যার, সর্জ, পুরি যার দেজ।
আমপাতা ঝরে গাছে কাঁঠাল পাতা
উড়ে যাচ্ছে শস্য, পুড়ে যাচ্ছে দেশ। (জবাব : সূর্য)

২. এই দেখে এই নেই
এ দেজড় তে নেই।
এই দেখি এই নেই
এদেশে সে নেই। (জবাব : বিজলী চমক)

৩. কালা পোরোড, মালা ভাজে।
কালো পুকুরে মালা ভাসে। (জবাব : চাঁদ)

৪. উড়ি উড়ি যায়, ধরি ন' পায়।
উড়ে উড়ে যায়, ধরা যায় না (জবাব : বাতাস)

৫. চালর উগুরে শিয়ান ছা
কিজাক কিজাক করে রা।
চালের উপর শেয়ালের ছানা
কী রকম কী রকম শব্দ করে। (জবাব : মেঘগর্জন)

৬. বর কলগত সুদা ফুদে
বিশাল সমতলে সুতা ফোটে। (জবাব : তারা)

দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহে নিত্যপ্রয়োজনীয় অনেক জিনিস ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ সকল অতি পরিচিত বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে চাকমা বানাহ্ তৈরি হয়েছে। যেমন—

১. ঘর আঘে দুয়ার নেই,
মানুচ আঘে র নেই।
ঘর আছে দুয়ার নেই
মানুষ আছে রব নেই। (জবাব : দেশলাই)

২. এ ঘর' বেটি ঐ ঘর যায়
ভেরাক বুরুক চাবর খায়
এ ঘরের বেটি ঐ ঘরে যায়
টাস টুস চাপড় খায়। (জবাব : কুলা)

৩. সরত আগুন বাচ্যে
কোলকাদাত ডাক পজ্যে।
শহরে (চট্টগ্রাম) আগুন লেগেছে
কলকাতায় ডাক পড়েছে। (জবাব : হুঁকা)

৪. উখে ঝনঝনায় পত্তে পাক খায়
আমন আধার পররে জগায়।
ঝনঝন উড়ে, পাক খেয়ে পড়ে
নিজের আহার পরকে খাওয়ায়। (জবাব : ঝাঁগিজাল)

৫. কাজা লকখে ভেকভেক্যা পাগিলে সিন্দুর
যে ভাঙি ন পারে তে গুখি শুদ্ধ উন্দুর।
যখন কাঁচা ভ্যাস ভেসে, পাকলে সিন্দুর
যে ভাঙাতে পারে না, তার গোষ্ঠী শুদ্ধ ইঁদুর। (জবাব : মাটির হাড়ি পাতিল)

৬. কাল্যা পুনান রাঙঙ্যা লিয়ায়।
কালা নিতম্বে লাল ওঠে। (জবাব : রান্নার পাতিল)

৭. খায়দে গুলর বোধু নেই।
খাবার গোটা, বোঁটা নাই। (জবাব : ডিম)

৮. গাত্ খুয়ায়, খাম ন খূয়ায়।
গর্ত খোলে, খুঁটি খোলে না। (জবাব : আংটি)

৯. চাল আঘে তলা নেই
পঝা থবার জাগা নেই।
চাল আছে তলা নেই
বোঝা রাখার জায়গা নেই। (জবাব : ছাতা)

১০. ছারা ঘরৎ বুরি দুদ্দুরায়
পোড়োবাড়িতে বুড়ি দাপাদাগি করে। (জবাব : খইভাজা)

১১. বিল' বগা বিলত চরে
বিল চুগেলে বগা মরে।
বিলের বক বিলে চরে
বিল শুকালে বক মরে। (জবাব : প্রদীপ)

১২. মরায় জেদা বয়।
মৃত জীবিতকে বহন করে। (জবাব : খড়ম)

১৩. মুরাহ উগুরে কাক্যা চলে।
পাহাড়ের উপর ভেলা চলে। (জবাব : চিরুণী)

১৪. শিরা নেই পেদা মানুচ গিলে।
মাথা নেই, গোটা মানুষ গিলে। (জবাব : জামা)

অন্যান্য বিষয় নিয়ে রচিত চাকমা বানাহ্‌র মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল :

১. আগাঝে ঘরবারি পাদলে দুয়ার
পবনে বাদাজে এযের আর যার।
আকাশে ঘরবাড়ি পাতালে দুয়ার
পবনে বাতাসে আসে আর যায়। (জবাব : বাবুই পাখির বাসা)

২. আহজিলে তগায়, পেলেহ্ ন' আনে।
হারালে খোঁজে, পেলে আনে না। (জবাব : রাস্তা)

৩. আহ্দের গুরগুরি ফাদের মাদি
ছয় চোখ তিন থোগোদি কাখুন আঘে ক।
হাঁটছে গড়গড় ফাটছে মাটি
ছয় চোখে তিন কারকাছে আছে বল।
(জবাব : কৃষক ও তার লাঙ্গলে জোড়া দুই বলদ)

৪. উদে দেম দেম ন' মেলে পাদা
যে ভাঙি ন' পারে তে জনম গাধা।
উঠে গোটা গোটা না মেলে পাতা
যে ভাঙাতে না পারে সে জন্মের গাধা। (জবাব : পশুর শিং)

৫. এক আহ্ধ গাচ্ছো
ফুল ফুদে পাচ্ছো।
এক হাত গাছ
ফুল ফুটে পাঁচ। (জবাব : হাত ও হাতের আঙুল)

৬. এক কানি ভুয়্যাৎ চেরকানি মাধা
পেক পত্তন জদা জদা।
মরা পেঘে যুদ্ধ গরে
যে বুঝে তে বুঝি পারে।
একখানি জমির চারখানি মাথা
পাখি বসেছে জটাজটা
মরা পাইকে যুদ্ধ করে
যে বুঝে সে বুঝতে পারে। (জবাব : পাশাখেলা)

৭. এক বিগোত্যা পাদি
গুথি শুদ্ধ আদি।
এক বিঘত পাটি,
গোষ্ঠী শুদ্ধ আটি। (জনাব : বই)

৮. কামাহ কুরো গাচ্ছো লরে-ন পরে।
খাড়া পাহাড়ের ধারে গাছটা নড়ে কিন্তু পড়ে না। (জবাব : চোখের ভ্রু)

৯. কালা রাদাল্যা খের খায়
যে ভাঙি ন পারে তে মের খায়।
কালো রাটায় খড় খায়
যে ভাঙাতে পারে না, সে মার খায়। (জবাব : চুল কাটার কাঁচি)

১০. দজ ভেয়্যে তগায়
দ্বি ভেয়্যে মারে।
দশ ভাইয়ে খোঁজে
দুই ভাইয়ে মারে। (জবাব : উকুন মারা)

১১. দ্বি রান চেগেই মধ্যে ভোরেই
চাপ দিলে কাম অহ্য়, যিয়্যান ভাবর সিয়্যান নয়।
দুই রান চিবে, মাঝখানে ভরে
চাপ দিলে কাজ হয়, যা ভাবছ তা নয়। (জবাব : হাত দিয়ে সুপারি কাটা)

১২. মুই আঘং খালে নালে,. তুই আঘচ, ঝুবত্তলে
তল্লই মল্লই দেখা অহ্ব মরণর কালে।
আমি আছি খালে নালে, তুমি আছ ঝোপের তলে
তোমার আমার দেখা হবে মরনের কালে। (জবাব : মাছ ও মরিচ)

চাকমা ধাঁধা রসের সমুদ্র। লোকজীবনে এখনও এর প্রচলন আছে। নাগরিক জীবনের স্পর্শে বর্তমানে প্রাচীন ধাঁধা লুপ্ত হতে চলেছে। লোকসাহিত্যের এই সম্পদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা একান্ত কর্তব্য।

লোককথা

গল্পবলা ও শুনার আগ্রহ মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি। 'লোকসমাজের সাধারণস্তরে রসগ্রহণের যে একটি সাধারণ মান (Standard) আছে, তাহার উপর লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক দেশেই একটি লৌকিক (Popular) কথাসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে-তাহা প্রত্যেক জাতিরই লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। গদ্য ও পদ্য উভয়বিধ রচনার ভিতরদিয়াই লৌকিক কাহিনী বর্ণনা করা হইয়া থাকে।' (আশুতোষ ২০০৪:৪০১) চাকমা জাতির লোকসাহিত্যের একটি প্রধান শাখা লোককথা। এই লোককথাগুলো শ্রুতি পরম্পরায় সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে। কে এই লোককথার রচয়িতা তা জানা যায় না। তবে এগুলো লোকসমাজে প্রচলিত ও প্রচারিত। লোককথাগুলো লোকসমাজের মনোরঞ্জন করে আসছে। লোককথায় অপ্রচলিত ও আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব উপকরণ বা উদাহরণ প্রচলিত থাকে। এজন্য রসগ্রহণে অসুবিধে হয় না। প্রাচীন লোকসমাজের কেউ এর প্রবর্তক। এসকল কাহিনী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে শ্রুতির মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে আসছে। তবে এ সকল কথার মধ্যে যে একটি অন্তর্নিহিত সর্বজনীন আবেদন রয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

চাকমা লোককথাকে তিন শ্রেণীতে বিন্যাস করা যায়। পুরাকথা, রূপকথা এবং উপকথা।

এক. পুরাকথা

পুরাকথা (Myths) বা কিংবদন্তিতে প্রতিফলিত হয় 'মানুষের আদিমতম বিশ্বাস; চিন্তাভাবনা, আচার-আচরণ, ভয়ভীতি, বিপদ থেকে উদ্ধারের ব্যাকুলতা, ধর্মীয় চেতনা, জৈবিক আবেদন, মানসিক উত্তেজনা ও উদ্বেল হৃদয়বৃত্তির নানাদিক।' (ইসলাম ১৯৯৩:৩৫) এসকল কাহিনীতে দেবতা, পৃথিবী, রাজা প্রমুখের কথা থাকতে পারে। লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন উপকরণ পুরাকথা। পুরাকথায় ধর্মীয় বিষয় ও বিশ্বাস স্থান পায়। যে সকল পুরাকাহিনীতে সত্য ঘটনার ছাপ থাকে সেগুলো হল কিংবদন্তি। কিংবদন্তিতে প্রচলিত সব কাহিনী সত্য নাও হতে পারে।

কিন্তু তাতে বক্তার বা শ্রোতার রসগ্রহণে কোন ইত্তরবিশেষ ঘটে না। বিশ্বের মহাকাব্যগুলোও তো পুরাকথা, কিংবদন্তির মিশ্রণে সৃষ্ট। 'পুরাকথা বা পুরাকাহিনী যেখানে সমাজজীবনের গভীরতম অভিজ্ঞতাকে গল্পাকারে প্রকাশ করে কিংবদন্তি সেখানে সত্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনশ্রুতির মাধ্যমে রূপ লাভ করে। পুরাকাহিনী কতকগুলো অমোঘ সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে কাহিনীর মাধ্যমে একটি উদ্দেশ্যের পথে যাত্রা করে-কিংবদন্তি সত্যকে আশ্রয় করেই তার পথ পরিক্রমায় অগ্রসর হয়। একের লক্ষ্য সত্য, অপরের আশ্রয় বা অবলম্বন সত্য। পুরাকাহিনীর অবয়বে আছে কল্পনা; আছে অতিলৌকিকতা, আছে ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানের ছাপ, আছে বিশ্বাসের প্রতিফলন, স্বপ্নের প্রভাব-অন্যপক্ষে কিংবদন্তিতে আছে সত্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিচিত্র জনশ্রুতি, সমাজজীবনের প্রতিবিম্বন, মানবিকতার বাস্তব ছায়া-অতিলৌকিক কল্পনার অবকাশ সেখানে তুলনামূলকভাবে সীমিত। উভয়ের অবলম্বন অবশ্য গল্পরস।' (ইসলাম ১৯৯৩:৪৭)

চাকমা সমাজে প্রচলিত দুটি উপকথা সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমা জাতি' (১৯০৯) গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। এ দুটি কাহিনীকে তিনি ঐতিহাসিক কাহিনী বলে অভিহিত করেছেন। এ দুটি কাহিনীর শিরোনাম হল 'জামাই মারনীর গল্প' এবং 'গোমতী নদীর কথা'। উল্লেখ্য জামাই মারনীর কাহিনীটি R.H.S. Hutchinson তাঁর Chittagong Hill Tracts District Gazetter (১৯০৯) গ্রন্থে ইংরেজিতে প্রকাশ করেছেন। সতীশচন্দ্র ঘোষ সংকলিত দুটি পুরাকথা আবদুস সাত্তারের 'আরণ্য জনপদে' গ্রন্থেও (১৯৬৫) বাংলা অনুবাদ সহ প্রকাশিত হয়েছে। কাহিনী দুটি নিম্নরূপ :

জামাই মারনী

আক্করি এক রাজা এইল্। তাত্তুন এককোয়া খুব দোল্ ঝি এইল। তার দোল্ সম্বাদ দেজে দেজে রাষ্ট্র হ্ল, আমাত্য সকল লগর গাভুর্ গাভুর্ পেয়ো লগে তারে লভাদ্যাই ছটফদি লাগিলাক্; পরে রাজা ঠিক গরি দিলদে একখান টারেঙ মাদাত্তুন যে ঝাম দিনাই বড় গাঙত পড়ি নাই, সাজুরি নাই, উকূলে পার হই পারিব; তারে তা ঝিবোরে দিব। কদজনে ঝাম দি দি মলাগ্, পিজে এক দিন্যা এক রাজা পোয়া এই নাই রাজ্য ঝিরে পেবাদ্যাই ঝাম্ দিদ চেল, রাজা তারে চেইন্যা ঝাম দিবার ন' দিল; তারপরদিন্যা ঝাম্ দিবার কধা হ্ল। রেদোৎ রাজা স্বপ্নে দেল দে, এককোয়া বুড়ী এইনাই, রাজারে বুদ্ধি শিগেই দিলদে বুগৎ-পিদৎ ও দ্বিহাদৎ দ্বিবা বালোজ বানি দিজ আর হাদৎ এককোয়া ছাদি ধরিন্যাই মিলি দিদ্ কোচ। এই কইনাই সেই বুড়ী মিলাবোয়া অদেগা হোল। বেইন্যা ঘুমুত্তুন্ উদি নাই রাজা পোয়াবোয়া রাজা কধাধগে বালোজ বানিনাই ঝাম দিল'। ঝাম দিনাই সাজুরিনাই বড় গাং পার হইনাই এইল। রাজা খুজি হইনাই সেই রাজা পোয়াবোয়ারে ঝিয়োরে দিল।

বাংলা অনুবাদ : এক ছিল রাজা। তাঁর ছিল এক সুন্দরী কন্যা। কন্যার সৌন্দর্যের সংবাদ দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো। তাকে বিয়ে করবার জন্য বিভিন্ন রাজপুত্রদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হলো। পরে রাজা ঠিক করে দিলেন, একটি উঁচু পাহাড়ের মাথা থেকে ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়ে সাঁতার কেটে যে নদী পার হয়ে অপর পারে উঠতে পারবে তার কাছে মেয়ে বিয়ে দেবেন। অনেকেই ঝাঁপ দিয়ে দিয়ে মরলো। পরে খুব সুন্দর এক রাজপুত্র রাজকন্যাকে পাবার জন্য ঝাঁপ দিতে এলো। রাজা তাকে দেখে ঝাঁপ দিতে নিষেধ করলেন। পরের দিন ঝাঁপ দেয়ার কথা হলো। রাতে রাজা স্বপ্নে দেখলেন, এক বুড়ি তাঁকে বুদ্ধি শিখিয়ে দিচ্ছে 'বুকে পিঠে ও দু'বগলে তুলার বালিশ ও হাতে একটি ছাতা ধরে সেই রাজপুত্রকে ঝাঁপ দিতে বলো।' এই বলে বুড়ি অদৃশ্য হলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাজপুত্র রাজার কথা মত ঝাঁপ দিল। ঝাঁপ দিয়ে সে নদীতে পড়ে সাঁতার কেটে ওপারে উঠলো। পরে রাজপুত্র রাজকন্যাকে বিয়ে করলো।

বিরাজমোহন দেওয়ানের 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' (১৯৬৯) গ্রন্থেও জামাইমারনী উপাখ্যানটি বর্ণিত হয়েছে। সতীশচন্দ্র ঘোষের মতে কর্ণফুলি নদীর উত্তরতীরে সীতাপাহাড় সংরক্ষিত বনাঞ্চল-এর অন্তর্গত চিৎমরং স্থানে রাজপুত্ররা ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়েছিল। এই কাহিনী অবলম্বন করে জীবেন্দ্র কুমার দত্ত 'প্রেমের সাধনা' নামে একটি কবিতা রচনা করেন। কবিতাটি মাসিক আলোচনা (৯ম সংখ্যা ১৩১৫ বঙ্গাব্দ) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। (ঘোষ ১৯০৯:৩৪৫) রাজপুত্ররা জামাই হতে গিয়েই পাহাড়থেকে ঝাঁপ দিয়ে মারা গেল। তাই পাহাড়টি জামাই মারনী নামে পরিচিত। পাহাড়টি চন্দ্রঘোনার পাশেই অবস্থিত।

গোমতী নদীর কথা

এত্তে এক বুর্য্যা। তে এধগ আলজি যে কলা তায়ৎ এরেই ন খায়। তাত্তুন দ্বিবা ঝি এলাগ। বুর্যা তারাদ্যায় একখান জুম কাবি দিনাই কিছু ন গত্ত। একদিন কালবৈশাগী দিনৎ তা দ্বিবা ঝি জুমৎ ধান কুজিদাগ্ জেইয়ন; বেল্ কদ্দুর যেইনাই দেবা আঁধার্য্যা কালা গল্লগৈ চের কেত্যাত্তুন ব বেদ লাগিল্। তারা থেবার জাগা নেই দেইনাই কবাল বিনেই বিনেই কান্দে লাগিলাগ। দাঙরবোয়া কয় দেয়, সাব হোগ, বেঙ হোগ, যেই হোগ, দেবতা হোগ, ভুত হোগ, পেরেৎ হোগ, রাজা হোগ, রেইয়ৎ হোগ, যে আমাথ্যে একখান ঘর তুলি দিব, মুই তার লোম। সিয়ান শুনিনাহ' এককোয়া বড় সাবে রাজভার বোইনাই তারাদ্যায় একখান ঘর তুলি দিল। তারা দ্বি বোনত্তুন দাঙর বোন নোয়াই সে সাপ্পেয়ারে লল্। তারাবারে বুর্যায় সেই কথা শুনিনাই সেই সাব্বোয়ারে, কাবি ফেল্ল। তা ঝিয়ে কান্দে কান্দে চোগ পানিয়ে দ্বারা যেই ভাই সেই ছরা পানি ডুবিনাই মর্যে। সেই ছরান নাং গোমেদ গাং। তিবিরা রাজা পোয়ায়ই সাববেজ ধরিনাই তারাদ্যায় ভিলে ঘর তুলি দো গৈ।

বাংলা অনুবাদ : এক ছিল বুড়ো। সে এত অলস ছিল যে কলার খোসা পর্যন্ত ছাড়িয়ে কলা খেত না। তার ছিল দু মেয়ে। বুড়ো তাদের কাছে জুমের ভার দিয়ে নিজে কিছুই করত না। একবার বৈশাখ মাসে যখন দুবোন জুম চাষ করতে গেল, বেলা কিছু হতে না হতেই আকাশ আঁধারে চেয়ে গেল। চারদিক থেকে বাতাস বইতে লাগল। কোনো আশ্রয় না পেয়ে দুবোন কপালে করাঘাত করে কাঁদতে লাগল। বড়জন বলল, সাপ, ব্যাঙ, দেবতা, দানব, ভূত, প্রেত, রাজা বা প্রজা যেই হোক, যে আমাকে এখানে একটি ঘর তুলে দিবে আমি তাকে বিয়ে করবো। একথা শুনে এক বিরাট সাপ বাঁশ বহন করে এনে ঘর তুলে দিল। বড়বোনটি সাপকে বিয়ে করল। তার পিতা একথা শুনে সাপটিকে মেরে ফেলল। এই দুঃখে বড় মেয়েটি কান্না করে করে দুচোখ পানিতে ভরে ফেলল। তার চোখের পানিথেকে সৃষ্ট নদীতে সে ডুবে মরল। এই নদীই গোমতী নদী।

এই পুরাকথার সঙ্গে চাকমা জাতির সাংস্কৃতিক বিশ্বাস জড়িত। পাহাড়-পর্বত নদ-নদী, পশুপাখি প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে অনেক আদিবাসীর মধ্যেই পুরাকথা প্রচলিত আছে। এই কাহিনীতে সংস্কার ও অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসের কথা আছে।

'তান্যাবির ফির্তি' একটি উল্লেখযোগ্য চাকমা কিংবদন্তি। এই কিংবদন্তিটি অনেকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। তান্যাবিকে নিয়ে গীতিকাহিনী রচিত হয়েছে। কবি সলিল রায় 'তান্যাবির উপাখ্যান' নামে দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। (সাপ্তাহিক সমতা ২৮ মার্চ ১৯৮০)।

চেঙ্গি নদীর উজানে রাঙ্গামাটির অনতিদূরে বাকছড়ি মৌজায় ছিল তান্যাবির ফির্তি নামে একটি মনোরম হ্রদ। হ্রদটি কাপ্তাই হ্রদের সঙ্গে মিশে গেছে। যে কাহিনী এ ফির্তির নেপথ্যে তা হল-তান্যাবি ভালোবেসেছিল বাল্যসখা পুনাংচানকে। সময়মত বিয়ের প্রস্তাবও করা হল। উভয়ের মা-বাবা বিয়েতে রাজি হন। কিন্তু নিয়তির পরিহাস। তুচ্ছ স্বার্থ নিয়ে উভয়ের পিতৃজনের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। তখন তারা ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু চিরকাল তো পালিয়ে থাকা যায় না। ধরা পড়ল তারা। তান্যাবি হল প্রৌঢ় বিপত্নীক কমলধনের পত্নী। বাসর রজনী শেষে তান্যাবি হল উন্মাদ। পুনাংচানও দেশত্যাগী। চেঙ্গিনদী তীরে বসে কাঁদে তান্যাবি।

'কান্না স্রোত ধার। বহি নিম্নগামী নদী বুকে ধায়/তবুও তাহার কান্না কভু কি ফুরায়?' তার কান্নায় জলে বান ডাকল। লবণাক্ত জলে দুকূলের সোনার ফসল হল বিনষ্ট। বেগবতী চেঙ্গি ভিন্ন পথে প্রবাহিত হল। একদা থেমে গেল তান্যাবির কান্না। কিন্তু কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না তার। মানুষের ধারণা আপন চোখের জলের সাগরে সে ডুবে মরেছে। কিছুদিন পর জলে ফুটল এক অপরূপ রঙিন শাপলা। লোকে বলে তান্যাবি শাপলা রূপে ফুটেছে। অনেকদিন পর ফিরল পুনাংচান।

উন্মন তাহার দৃষ্টি হাতে শুধু একটি বেহালা
লোকে বলে গেংখুলি সে রচিয়াছে তান্যাবির পালা।
যুবাজনে শুনালো সে গেয়ে গেয়ে তান্যাবির গান
অতুল রচনা তার মর্মস্পর্শী প্রেমের ব্যাখান।

পুনাংচানের সুরের জালে বনবনান্তর ছেয়ে গেল। সাতদিন সাতরাত এক ঠাঁই বসে একটানা বেহালা বাজালো সে। পরদিন ভোরে দেখা গেল সে নেই, বেহালা পড়ে আছে মাটিতে।

পুনাংচান নেই সে তো কোনখানে নেই দেখা তার
সায়রে ফুটেছে শুধু একজোড়া শাপলা এবার।

(শর্মা ২০০৩:৫১-৫২; কবিতাংশ সলিল রায়ের রচনা থেকে)

দুই. রূপকথা

রূপকথায় থাকে রোমান্সধর্মী কাহিনী। এতে কল্পনার অবাধ বিস্তারের সুযোগ আছে। 'রূপকথায় একজন নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র থাকে, একজন খল বা ভিলেন থাকে, নায়কের সাহায্যকারী চরিত্র বা শক্তি থাকে, নায়িকা থাকে, যাদুদ্রব্য বা প্রাণী থাকে, খলের সাহায্যকারী চরিত্রও থাকতে পারে, প্রতিনায়ক ও প্রতিনায়িকা থাকতে পারে, দেবতা বা স্বর্গীয় পুরুষও থাকতে পারে। ঘাত, প্রতিঘাত ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে রূপকথার কাহিনী অগ্রসর হয়-নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্র অনেক বাধা অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত জয় লাভ করে। রূপকথা মিলনাত্মক। রূপকথায় সাধারণত একত্রিশটি ক্রিয়াশীলতা (Function) থাকে, কোন কোনটিতে কমও থাকতে পারে। কাহিনী পরিভ্রমণের সময় অনেক ক্ষেত্রে বিষয়ের হেরফের ঘটে; কিন্তু ক্রিয়াশীলতার কোন নেই পরিবর্তন ঘটে না। কাহিনীর পরিবর্তনীয় শক্তিকে বলা হয় Variable এবং অপরিবর্তনীয় উপাদানকে বলা হয় Constants... রূপকথার কাহিনী বেশ দীর্ঘ হয়; এর পরিসর জলস্থল আকাশ-মাটি-সমুদ্র, মরুভূমি-পর্বত-সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তারিত, এর ঘটনায় কল্পনা ও বাস্তবের সমন্বয় ঘটে, অতিলৌকিক ও ঐন্দ্রজালিক ঘটনার পাশে মানবীয় সুখদুঃখ হাসিকান্নার চিত্র, কাহিনীতে দেখা যায়।' ইসলাম ১৯৯৩:৪৮)

চাকমা সমাজে অনেক রূপকথা প্রচলিত আছে। তবে অনেক উপকথাও রূপকথা নামে প্রকাশিত হয়েছে। 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থে আবদুস সাত্তার 'বাঁদরীর কিততা' নামে একটি রূপকথা মূল চাকমা ভাষায় (বাংলা অনুবাদ সহ) প্রকাশ করেছেন। রূপকথাটি হল :

ভালক বছর আগর কদা। এক দেশত উককা রাজা মোগ পো লই সুগে শান্তি তে বাস গড়ত। রাজাত্তুন চেরবো গুনবান পো এলাগ। চেরবো পোততুন বেশ চিগন

পো ব্যো বেগতত্তুন বেশ চালাক। তার বড়বেইয়ুনে কোন মতে কোন দিগন দি তারে ঠগেই ন পোরতাক। যারে কইয়ে তে চের দিগনদি পটু। কি বিদ্যায় কি কামে কর্যে সব দিগনদি তার বড় বেইয়ুনে যেয়ান ন পারতাক তে সেয়ান পারত। সেনত্যাই রাজা রানী তারে খুব বেশ আদর গড়তাক। কয়েক বছর পর পোগুণ বো পেবার কাবিল অয়ন। একদিনে বেগ পোউনরে তায়দু ডাকিলো তে কলদে, 'ও পুতলক, তুমিও তিন বেই উপযুক্ত অয়ো। এবার ঠিক গর কনে কুনদিতুন বো আনিবা।

বড় পোবো সেনে বলাক, বাবা, যে যে দেশত বানহ্ নিক্কেপ গড়িব তে সে দেশততুন বো আনিবো। রাজা সে কথাগান মনর খুশীয়ে মানি নিলো।

একদিন্যা, রাজা চের পোগুনে কলাক। বা অ পুতলক, কনদিন বান নিক্কেপা গড়লাক।

তারপর সেনে একদিন্যা বান নিক্কেপ গড়বার দিন স্থির অল। ডাঙ্গর তিন বেইয়ে উত্তর পুগে পচ্ছিমে তিন দিগনদি বান নিক্কেপ গল্যাক। তিন বেইয়ের বান তিন দেশত গড়িলে। তারা তিন দেশতুন তিননোয়া দোল দোল বয়জ কন্যা পেলাক। এবার বেশ চিগন বেইয়ের তীর নিক্কেপ গরানার পালা।

তেয়ো খুব ভাবি চিন্তি আকাশ মক্খ্যা তীর নিক্কেপ গললো। অনেক দেশত পার হই এক অঘোর ঝাড়ত তীর পোলগোই। তগাদে তগাদে চীগন পোবা শেষে ঝাড়ত খোঁজ পেলকগই। যে দেশত এক বাঁদরী বাস গরত। এবার এ খবর সেইল্যায় তিন বেইয়ে খুব খুজী হলাক। কারণ তাততুন নিচ্চয় সেই বাঁদরীরে বো হিসাবে গ্রহণ গরা পড়িবো এবার তারে ঠগেই পেবাক। বেগ বেইয়ুনে দোল দোল বো পেলাগ বানা তে উককা বাদরী পেল। এবার তারে বেগ বেইয়ুনে খুব তাততা গড়া আরম্ভ গল্লাক। এভাবে তার তিন বেইয়ে তারে তাততা কারঘাততেই বাকী নূতন নূতন উপাই বাহির গরলাক। একবার তিন বেইয়ে ঠিগ গল্লাক চের বেইয়ের বো এর মধ্যে রান্না ইদাহদ দিল। এবার তারা নিচ্চয়ই জিতি পারিবেক। হদাহদ আরম্ভ অ'ল। তিন চের বেইয়ের রান্নার মধ্যে রাজা সব চিগন পো'র বো'র রান্না বেশ গম পেল। এবার বড় বেই বেগুন ঠকি পেলাক।

তারপর আর একদিন্যা ঠিক গল্লাক বো এর মধ্যে বুনানার হদাহদ তা অব। এবার এ কথা শুনিনেই চিগন পোর মনত খুব চিন্তা লাগিল। সেয়ান দেইন্যায় তারে বাঁন্দরী পুজার গললো। তর কি অয়ে? তারপর তে কল', তরে কইন্যায় অ কোন লাভ নেই। অনেক পুজার গড়ানার পরে কঅল তা কেইল্যা আমার বোঅর মধ্যে বুনন হদাহদ হব তার উত'রে সেই বাঁদরী কলদে এর কোন চিন্তার কারণ নেই। তুই কন চিন্তা ন গরিছ। বুনানর কামড় কাপড় বো বেক্কুনে রাজারে দেগেলাক তারপর বাঁন্দরীর তৈয়ারী কাপড় লইন্যায় চিগন পো বা রাজার দূত হাজির অল।

এককান চিগন কাপড় চিয়ান মেলতে মেলতে রাজ্য ভরি গেল। তোয়া বেক্কান মেলা না অল। রাজা সেয়ান দেইন্যায় ভারী খুজী অলাক। এবারে অন্য বেককুনে পরাজয় অলাক। এবার খুব মনর দুগে অন্য বেইয়ুনে দিন যাপন গরতন।

আর একদিন্যা ঠিক গচ্যনদে তারার বোঅর মধ্যে দোল হদাহদ অবা এ হদাহদানত তারা নিশ্চয়ই বাঁন্দরী জামাইর বোয়ে হদিবাক। এ হদাহাদহদে তার কথা শুনিন্যা চিগন পোবোর মাদাত বাঁশ পড়ে পারা অল। বোয়াতে মনর দুগে ঘরত ফেরত এল। তারে দুঃখিত দেখিন্যাই তার বোর মনত চিন্তা অল। তার বো মনে মনে কততে এছ্যা নিশ্চয়ই তে কোন কিছুথ্বাই মনত দুঃখ পিয়ে, শেষে বিজার গড়িনাই জানিলদে আগামীকেইল্যা তারার বোএর মধ্যে দোল হদাহদ অব। এই কথা শুনিন্যাই বান্দরী জামাইব' কলদে তর চিন্তা গড়া ন' পড়িবো। তুই কন চিন্তা ন গড়িছ। বানা তুই মরে এককান কাম সাহায্য গোল্যেই ঠিক অব সে কাম্মান অত্তে মুই যখন ম বাদর চামান ফেলেই যেইম সেককে সে চামান তুই আগুনত দি দিবে। তারপর বিল্ল্যা সময় মত বাঁদরী যখন তা চামান ফেলেই অন্য কিত্যা যেয়ে সেককে বাঁদরী জামাই বো এর সিয়ান আগুনত দি দে। তারপর বোরে কল' তুই মানুষ অ। সে কধা কধে কধে বাঁদরী মানুষ অল। তার দোলে তারার ঘর আলোক পেলাক। বৈদত আলো দেইন্যাই মানয্যে মনে গল্লাক তারার ঘর আগুন ধচ্চে। কিন্তু যেইন্যায় দেখিল দে আগুন নয়। চিগন প্যোর বোএর আলোয় তারার ঘরত আলোক পেলাক। এবারও হদাহদে তার জয় অল। আগ জনমও বাঁদরী ইক্কা পরী এল। এবার রাজা ভারী খুজী হল।

বাংলা অনুবাদ : অনেক দিন আগের কথা। এক দেশে এক রাজা স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে শান্তিতে বাস করছিলেন। রাজার চারজন গুণবান পুত্র ছিল। চার ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে ছিল খুব চালাক। তার বড় তিন ভাই কোন ভাবেই ছোট ভাইকে ঠকাতে পারতো না। যাকে বলে চালাক। কী জ্ঞান, কী বুদ্ধিতে তার বড় ভাইয়েরা যা না পারতো তা সে পারতো। এ কারণে রাজা এবং রাণী তাকে খুব আদর করতেন। কয়েক বছর পর তারা বিয়ের উপযুক্ত হলো। একদিন রাজা সব ছেলেকে ডেকে বললেন তোমরা এখন উপযুক্ত। এবার ঠিক করে বলো কোন দিক থেকে বৌ আনবে।

বড় ছেলে বললো, বাবা, আমরা যে দেশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবো সেই দেশে বিয়ে করব।

রাজা মনের খুশিতে তা মেনে নিলেন। একদিন রাজা চার ছেলেকে বললেন, বল, বৎসগণ কবে তীর নিক্ষেপ করবে।

অতঃপর একদিন তীর নিক্ষেপ করার সময় স্থির হলো। বড় তিন ভাই উত্তর পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। তিন ভাইয়ের তীর তিন দেশে গিয়ে

পড়লো। তারা তিন দেশ থেকে তিন সুন্দরী রাজকন্যা নিয়ে এলো। এবার ছোট ভাইয়ের তীর নিক্ষেপ করার পালা।

সে খুব ভেবে চিন্তে আকাশমুখো তীর নিক্ষেপ করলো। অনেক দেশ পার হয়ে তার তীর এক গহীন জঙ্গলে গিয়ে পড়লো। খুঁজতে খুঁজতে ছোট ছেলে সেই জঙ্গলের সন্ধান পেয়ে গেল। সেই দেশে এক বাঁদরী বাস করতো। এই সংবাদ শুনে বড় তিন ভাই খুব খুশি। কেননা, তাদের ছোট ভাইকে নিশ্চয়ই সেই বাঁদরীকে বিয়ে করতে হবে। এবারে নিশ্চয়ই তারা ছোট ভাইকে ঠকাতে পারবে। কেননা তারা সবাই পেয়েছে সুন্দরী সুন্দরী স্ত্রী আর সে পাবে এক বাঁদরী। এবারে সব ভাই মিলে তাকে ঠাট্টা করা আরম্ভ করলো। এভাবে তার তিন ভাই ঠাট্টা করবার নতুন নতুন উপায় বের করতে লাগলো। একবার তিন ভাই মিলে ঠিক করলো যে, চার ভাইয়ের স্ত্রী মিলে রান্নার পরীক্ষা দেবে। এবারে তারা নিশ্চয়ই জিততে পারবে। পরীক্ষা শুরু হলো। চার বৌয়ের রান্নার মধ্যে রাজা ছোট বৌয়ের রান্না ভাল বোধ করলেন। এবার সব বড় ভাই ঠকে গেলো।

অতঃপর আর একদিন ঠিক করলো যে চার বৌয়ের মধ্যে কাপড় বুননের পরীক্ষা হবে। একথা শুনে ছোট ছেলে মহা ভাবনায় পড়লো। তা দেখে বাঁদরী স্বামীকে বললো যে, চিন্তার কারণ নেই। তুমি ভেবো না। অতঃপর বাঁদরীর তৈরি কাপড় রাজাকে দেখানো হলো। রাজা সেই মিহি কাপড় ছড়াতে ছড়াতে দেখেন যে তা সারা রাজ্যময় বিস্তৃত হয়ে যায়। অথচ সবটুকু শাড়ি ছড়ানই হয় নি। রাজা ভীষণ খুশি হলেন। এবারে সবাই পরাজিত হলো। মনের দুঃখে সবাই কাল কাটাতে লাগল।

আর একদিন সবাই ঠিক করলো যে চার বৌয়ের মধ্যে সৌন্দর্যের পরীক্ষা হবে। এবারে নিশ্চয় বাঁদরীর স্বামীর স্ত্রী পরাজিত হবে। এ প্রতিযোগিতার কথা শুনে ছোট ছেলের মাথায় বাজ পড়লো। মনের দুঃখে সে ঘরে টিকতে পারে না। তার দুঃখ দেখে তার স্ত্রীর মনে ভাবান্তর দেখা দিলো। যাক তবু সে স্বামীকে বললো যে তার কোন চিন্তার কারণ নেই। আরও বললো, কাল সকালে এক ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করতে হবে। আমি যখন আমার বাঁদরীর চামড়া ফেলে দেব সেটা তুমি আগুনে ফেলে দেবে। আর তুমি আমাকে বলবে, তুই মানুষ হ।

যেমন কথা তেমনি কাজ। বাঁদরী এবারে মনুষ্য রূপ ধারণ করলো। সৌন্দর্যে সমস্ত ঘর আলোকিত হলো। বিদ্যুতের মতো আলো দেখে সবাই মনে করলো রাজার ছোট ছেলের ঘরে আগুন ধরেছে। কিন্তু সকলেই দেখলো যে আগুন নয়। ছোট ছেলের বৌয়ের সৌন্দর্যে ঘর আলোকিত হয়ে আছে। এই প্রতিযোগিতায়ও সে জয়ী হলো। আসলে সে বাঁদরী নয়, ছদ্মবেশী পরী। এবারে রাজা আরও খুশি হলেন। (সাত্তার ১৯৭৮:৩১৭-৩২১)

তিন. উপকথা

উপকথা রূপকধর্মী লোককাহিনী বা নীতিবাচক লোককথা। এর কাহিনী সাধারণত সংক্ষিপ্ত। উপকথায় চরিত্র হিসেবে আসে পশুপাখি, কীটপতঙ্গ বৃক্ষগুল্মলতা ইত্যাদি। মানুষও থাকতে পারে। 'মানুষ ছাড়া আর যে সব চরিত্র থাকে তারাও মানুষের মতই আচরণ করে এবং কথা বলে। আরেকটি বিশেষ লক্ষণ এই যে কাহিনীর শেষে থাকে একটি নীতিকথা এবং সমগ্র কাহিনী যেন এই নীতিবাক্যটিকে প্রতিপন্ন করবার জন্যেই প্রথম থেকে তৈরি হতে থাকে। নীতিবাক্যের উদ্দেশ্যেই কাহিনীর সমগ্র কাঠামো নির্মিত হয়।' (ইসলাম ১৯৯৩:৪৯) নীতিকথা ছাড়াও পশুপাখিকে নিয়ে উপকথা রচিত হয়। তখন এর নাম হয় প্রাণিবাচক লোককথা। চাকমা সমাজে বেশ কিছু উপকথা প্রচলিত আছে। বঙ্কিম দেওয়ান-এর 'চাকমা রূপকাহিনী' গ্রন্থে 'টুনটুনি আর হুমো বেড়াল' নামে একটি উপকথা আছে। এর কাহিনী নিম্নরূপ :

এক ছিল হুমো বেড়াল আর এক ছিল টুনটুনি। টুনটুনি বাসা বাঁধছে শুনে বেড়াল তা দেখতে চায়। কিন্তু টুনটুনি জানায় মাত্র খড়কুটো সংগ্রহ করছে। এভাবে বেশ কিছু দিন যায়। টুনটুনিকে জিজ্ঞেস করলে জানায় এখনও বাসা তৈরির কাজ চলছে। ওদিকে বাসা তৈরি করে টুনটুনি ডিম পেড়েছে, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়েছে। এ খবর পেয়ে বেড়াল হামলা করল টুনটুনির বাসায়। কিন্তু বাচ্চাগুলো ফুড়ুৎ করে পালিয়ে গেল। হুমো বেড়ালকে জব্দ করে টুনটুনি গান ধরল—

আমার বনে খেই ন পেলা
ঈ হি মজকরে জক!
আমার বন্ধু খেতে পারল না
কী মজা কী মজা।

টুনটুনি আনন্দে নাচতে থাকে। তখন একটা কাঁটা বিঁধল তার লেজে। সে নাপিতকে গিয়ে বলল—

নাবিত ভেই সারছ
ম পুন' কাদাবুয়ানি...
খুয়েই দি পারছ?
নাপিত ভাই সাবাস
আমার লেজে কাঁটা নি
খুলে দিতে পার?

নাপিত জানাল ধারালো নরুন লেজে লাগালে সে তো মারা যাবে। এতে অপমানিত বোধ করে টুনটুনি নাপিতকে সাজা দেবার জন্য ইঁদুরের কাছে গিয়ে বলল—

উন্দুর ভেই সারছ!
নাবিতঅ ছম্পদর তারাবুয়ানি
কামেরেই দি পারছ?
ইঁদুর ভাই সাবাস
নাপিতের যন্ত্রের বাক্সটিকে
কামড়াতে পার?

নাপিত বাক্স এমনভাবে ঝুলিয়ে রাখে যে তা ইঁদুরের পক্ষে কামড়ানো কঠিন। একথা শুনে টুনটুনি ইঁদুরকে শিক্ষা দেবার জন্য গেল মেনি বেড়ালের কাছে। বলল—

বিলেই ভেই সারছ
উন্দুয্যারে নি
ক্যামেরেই পারছ
বেড়াল ভাই সাবাস
ইঁদুরটাকে কি
কামড়াতে পার?

ইঁদুর গর্তে থাকে। তাই বিড়াল অপারগতা জানালে তাকে শাস্তি দেবার জন্য টুনটুনি কুকুরের কাছে গিয়ে বলল—

কুগুর ভেই সারছ
বিলেইবুয়ায়ে নি
কামেরেই পারছ?
কুকুর ভাই সাবাস
বেড়ালটাকে কি
কামড়াতে পার?

বিড়ালকে তাড়া করলে গাছে চড়ে। তাই কুকুর তাকে কামড়াতে পারবে না বললে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিতে টুনটুনি মুগুরের কাছে গিয়ে বলল—

মুগুর ভেই সারছ
কুগুরবরেনি
মুগুরেই পারছ?
মুগুর ভাই সাবাস
কুকুরটাকে কি
ঠ্যাঙাতে পার?

মুগুর জানাল কেউ তাকে নিয়ে কুকুরকে মারতে পারে; সে তো হাঁটতে পারে না। টুনটুনি রাগ করে মুগুরকে পোড়াবার জন্য অনুরোধ জানাল আগুনকে—

আগুন ভেই সারছ
মুগরবরেনি
পুরি ফেলেই পারস?
আগুন ভাই সাবাস
মুগুরটাকে কি
পোড়াতে পার?

আগুনও নিজে যেতে পারে না। কাউকে নিয়ে মুগুর পোড়াতে হবে। এবারে টুনটুনি আগুনকে শায়েস্তা করার জন্য পানির কাছে গিয়ে বলল—

পানি ভেই সারছ!
আগুনাননি
মারে ফেলেই পরেস?
পানি ভাই সাবাস
আগুনটাকে কি
নেভাতে পার?

পানিও নিজে গিয়ে আগুন নেভাতে পারে না। টুনটুনি এবার রাগ করে হাতির কাছে গিয়ে বলল—

এ্যাহ্ধ ভেই সারছ!
পানিয়ান নি
পি-খেই পারছ?
হাতি ভাই সাবাস
পানিটাকে কি
গিলে ফেলতে পার?

পানি পান করলে পেট ফুলে যাবে বলে হাতি পানি পান করতে অস্বীকৃতি জানালো। তখন টুনটুনি মশাকে গিয়ে বলল—

মঝা ভেই সারস!
এ্যাহত্তুয়ারে নি
গুজুরেই পারছ?
মশা ভাই সাবাস বড়
হাতিটাকে কি
ডাক ছাড়াতে পার?

এবারে কাজ হল। মশার ঝাঁক হাতিকে আক্রমণ করল। লাখ লাখ মশার কামড়ে অতিষ্ট হয়ে হাতি গেল পানির কাছে। পানি ভয় পেয়ে আগুন নেভাতে চলল। আগুন আত্মরক্ষার জন্য গেল মুগুর পোড়াতে। মুগুর চলল কুকুরকে শায়েস্তা করতে। কুকুর চলল বেড়ালকে কামড়াতে। বেড়াল চলল ইঁদুর ধরতে। ইঁদুর চলল নাপিতের বাক্স কামড়াতে। নাপিত টুনটুনির লেজের কাঁটা খুলতে গেল।

বহু ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত টুনটুনির লেজে নরুন স্পর্শ করানো মাত্র টুনটুনি মারা গেল।

এই উপকথার শিক্ষণীয় বিষয় হল কারো ক্ষতি করতে গেলে নিজের ক্ষতি হয়। পরকে হয়রান করতে গেলে নিজেই হয়রানির শিকার হবে।

লোককথা সংগ্রহ

চাকমা লোককথাগুলো বিভিন্ন গ্রন্থে ও সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি লোককথার উল্লেখ করা গেল।

R.H.S. Hutchinson-এর Chittagong Hill Tracts District Gazetter (1909) গ্রন্থে জামাই মারনীর কাহিনী এবং রাজা বারানসী ও সাতপুত্রের কাহিনী ইংরেজিতে বর্ণিত হয়েছে। Bangladesh District Gazetteers CHITTAGONG HILL TRACTS (1975) গ্রন্থেও কাহিনী দুটি সংকলিত হয়েছে।

সতীশচন্দ্র ঘোষের 'চাকমা জাতি' (১৯০৯) গ্রন্থে 'জামাই মারনী' ও 'গোমতী নদীর কথা' লোককথা দুটি বর্ণিত হয়েছে।

আবদুস সাত্তার-এর 'আরণ্য জনপদে' (১৯৬৬) গ্রন্থেও কাহিনী দুটি চাকমা ভাষায় (বাংলা অনুবাদ সহ) বর্ণিত হয়েছে। তাঁর 'আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য' (১৯৭৮) গ্রন্থে চাকমাভাষায় বর্ণিত হয়েছে দুটি কাহিনী-গুজা ও কালার কাহিনী এবং বাঁদরীর কিততা। প্রথম কাহিনীটি সুদীর্ঘ। দ্বিতীয় কাহিনীর বাংলা অনুবাদও দেয়া হয়েছে। তাঁর 'জলটঙ্গী (১৯৭৯) পুস্তকে 'জামাইমারনী' কাহিনী এবং 'উপজাতীয় রূপকথা' (১৯৮০) পুস্তকে 'বাঁদরীর কাহিনী' ও 'অহঙ্কারী শিয়াল' (বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান সংগৃহীত) সংকলিত হয়েছে।

বান্দরবান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'ঝরনা' পত্রিকার (সেপ্টেম্বর ১৯৬৬-সেপ্টেম্বর ১৯৬৭) চার সংখ্যার এবং রাঙ্গামাটি থেকে প্রকাশিত মাসিক 'পার্বত্য বাণী'তে (ডিসেম্বর ১৯৬৭-সেপ্টেম্বর ১৯৬৮) ছয় সংখ্যায় বঙ্কিম দেওয়ান 'চাকমা রূপকাহিনী' শিরোনামে কয়েকটি চাকমা রূপকথা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া 'পার্বত্যবাণী'-তে (মে ১৯৬৮) নীপাটি চাকমার 'ভাইধন পাখি' শীর্ষক রূপকথা প্রকাশিত হয়।

বিরাজমোহন দেওয়ানের 'চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত' (১৯৬৯) গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে দুটি লোককথা-জামাইমারনী উপাখ্যান এবং সুদত্তপি ও খচ্য ব্যাঙ্ (টুনটুনি ও কুনোব্যাঙ)। দ্বিতীয় কাহিনীটি বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ানও লিপিবদ্ধ করেছেন কিন্তু কাহিনীতে সামান্য পার্থক্য আছে।

১৯৭৮-৭৯ সালে সাপ্তাহিক বনভূমি পত্রিকায় 'ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় সুগত চাকমার 'রোঙ্গাবেঙ্গা দি গ্রেটেস্ট চাকমা গুলিস্ট' নামক দীর্ঘ লোককথা।

১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী থেকে তাঁর 'চাকমা রূপকথা' প্রকাশিত হয়েছে। এতে সংকলিত হয়েছে চারটি লোককথা-বনবিলাস, বনের পশুর মেস, গপ্পোবাজ রোঙাবেঙা এবং কবি ও ধবি।

বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ানের 'চাকমা রূপকাহিনী' (১ম খণ্ড) ১৯৭৯ সালে রাঙ্গামাটির উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এতে সংকলিত হয়েছে পাঁচটি লোককাহিনী। কাহিনীগুলোর শিরোনাম (১) সুরোন্যা সুরোনী, (২) টুনটুনি আর কুনো ব্যাঙ, (৩) অমগদ চাকমা, (৪) বুড়োবুড়ি আর বাঁদরের দল এবং (৫) বনবিলাস। গ্রন্থটির পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ একই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত হয়েছে ২০০০ সালে। এই সংস্করণে নতুন করে সংযোজিত হয়েছে পাঁচটি কাহিনী (১) রোঙ্যা বেঙার তামাক খাওয়া (এটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রকাশিত বিজুসংকলন 'বৈসাবি' ১৯৯৬-তে পূর্বে প্রকাশিত), (২) টুনটুনি আর হুমোবিড়াল, (৩) শেয়ালের নাকানি (এটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রকাশিত বিজু সংকলন 'বৈসাবি' ১৯৯৮-তে পূর্বে প্রকাশিত), (৪) ছিপি আঁটা পণ্ডিত এবং (৫) ধ'বি আর ক'বি (এটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রকাশিত 'গিরিনির্ঝর' ফেব্রুয়ারি ১৯৮২-তে পূর্বে প্রকাশিত)।

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাঙ্গামাটি প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা 'গিরিনির্ঝর' বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত অন্যান্য চাকমা কিংবদন্তি বা রূপকথা বা লোককাহিনীগুলো হচ্ছে-বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ানের 'ননাকাজী' (২য় সংখ্যা মে ১৯৮২) ও বার্গী পজঝন (৩য় সংখ্যা মার্চ ১৯৮৩); সুগত চাকমার 'পাগলা রাজার কাহিনী' (১ম সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৮২), রীণা দেওয়ানের 'দুলুকুমারী (১ম সংখ্যা মে ১৯৮২) এবং কৃষ্ণচন্দ্র চাকমার 'ও ভেইধন পেইক' (৫ম সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭), 'রোঙাবেঙার ধুন্দাখানা (৬ষ্ঠ সংখ্যা জুন ১৯৮৮) ও 'শিয়াল' (৭ম সংখ্যা জুন ১৯৮৯)।

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাঙ্গামাটি প্রকাশিত বিজু সংকলন 'বৈসাবি' বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত চাকমা লোককথাগুলো হচ্ছে সুগত চাকমার 'কেচকুমারী কন্যা' (১৯৯৬), 'মুলঝি কন্যা' (১৯৯৮) ও 'মালোকখিমা এবং মিশাঙ্যা ও চুচ্যাঙার গল্প' (২০০৪) এবং কৃষ্ণচন্দ্র চাকমার 'গুঅচেল্যা বলী' (২০০৩), গুনচঅ পজ্জন (২০০৪) ও 'কুম্বলেনী' (২০০৬)।

জুম ঈসথেটিকস্ কাউন্সিল রাঙ্গামাটি প্রকাশিত বিজুসংকলনগুলোতে প্রকাশিত চাকমা লোককথাগুলো হচ্ছে-সুগত চাকমার 'রাঙামাটির রাজকন্যা রাঙাবি' (লান ১৯৯৯), লগ্নকুমার চাকমার 'পারাপাঙ' (চাকমাভাষায়, আমাঙ, ২০০৩) এবং চিত্রমোহন চাকমার 'বুদ্ধিমান যুবকের বুদ্ধিমান স্ত্রী' (আমাঙ ২০০৩) ও 'দেমখুলা কুমীর' (কাওয়াং ২০০৪)।

সূত্রনির্দেশ

গ্রন্থ

অমলেন্দু ভট্টাচার্য : বরাক উপত্যকার বারমাসী গান। শিলচর ১৯৮৪

আবদুস সাত্তার : আদিবাসী সংস্কৃতি ও সাহিত্য। ঢাকা ১৯৭৮

আরণ্য জনপদে। ঢাকা ২য় সংস্করণ ১৯৭৫

আবুল ফতেহ ফাত্তাহ : সিলেট গীতিকা : সমাজ ও সংস্কৃতি। ঢাকা ২০০৫

আশরাফ সিদ্দিকী : লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড)। ঢাকা, পরিমার্জিত সংস্করণ ১৯৯৪

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস। কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ ১৯৭০

বাংলার লোকসাহিত্য (১ম খণ্ড)। কলকাতা, ৫ম সংস্করণ ২০০৪

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইন্সটিটিউট রাঙ্গামাটি : চান্দবী বারমাস ও চিত্ররেখা বারমাস। ২০০৩

ওয়াকিল আহমদ : লোককলা প্রবন্ধাবলি। ঢাকা ২০০১

জাফার আহমাদ হানাফী : উপজাতীয় নন্দন সংস্কৃতি। ঢাকা ১৯৯৩

নন্দলাল শর্মা : আকাশে হেলান দিয়ে। রাঙ্গামাটি ২০০৩

: চাকমা কবিতা। ঢাকা ২০০৮

: চাকমা প্রবাদ। ঢাকা ২০০৭

সিলেটের বারমাসী গান। ঢাকা ২০০২

বঙ্কিমকৃষ্ণ দেওয়ান : চাকমা প্রবাদ প্রবচন বাগধারা ও ধাঁধাঁ। রাঙ্গামাটি ২০০৫

চাকমা রূপকাহিনী। রাঙ্গামাটি ২য় সংস্করণ ২০০০

বঙ্কিমচন্দ্র চাকমা : চাকমা সমাজ ও সংস্কৃতি। রাঙ্গামাটি ১৯৯৮

বরুণ কুমার চক্রবর্তী : গীতিকা : স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য। কলকাতা ১৯৭৩

বিরাজমোহন দেওয়ান : চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত। রাঙ্গামাটি ২য় সংস্করণ ২০০৫

মনিরুজ্জামান : লোকসাহিত্য ভিতর ও বাহির। ঢাকা ২য় সংস্করণ ২০০২

মযহারুল ইসলাম : ফোকলোর : পরিচিতি ও পঠন পাঠন। ঢাকা ১ম পুনর্মুদ্রণ ১৯৯৩

শশিমোহন চক্রবর্তী : শ্রীহট্টীয় প্রবাদ প্রবচন। কলকাতা, ১৯৭০

সতীশচন্দ্র ঘোষ : চাকমাজাতি। কলকাতা ১৯০৯

সুগত চাকমা : চাকমা পরিচিতি। রাঙ্গামাটি ১৯৮৩

: বাংলাদেশের চাকমা ভাষা ও সাহিত্য। রাঙ্গামাটি ২০০২

সুগত চাকমা (সম্পা.) : রাধামন ধনপুদি। রাঙ্গামাটি ২০০৪

Mohmmad Ishaq Ed. Bangladesh District Gazetteers CHITTAGONG HILL TRACTS. Dacca 1975